Manusher Jonno Foundation

Funded by
the European Union

পুষ্টিকর আহারে
সুস্থ-সবল-সুন্দরভাবে
বেড়ে উঠি পাহাড়ে

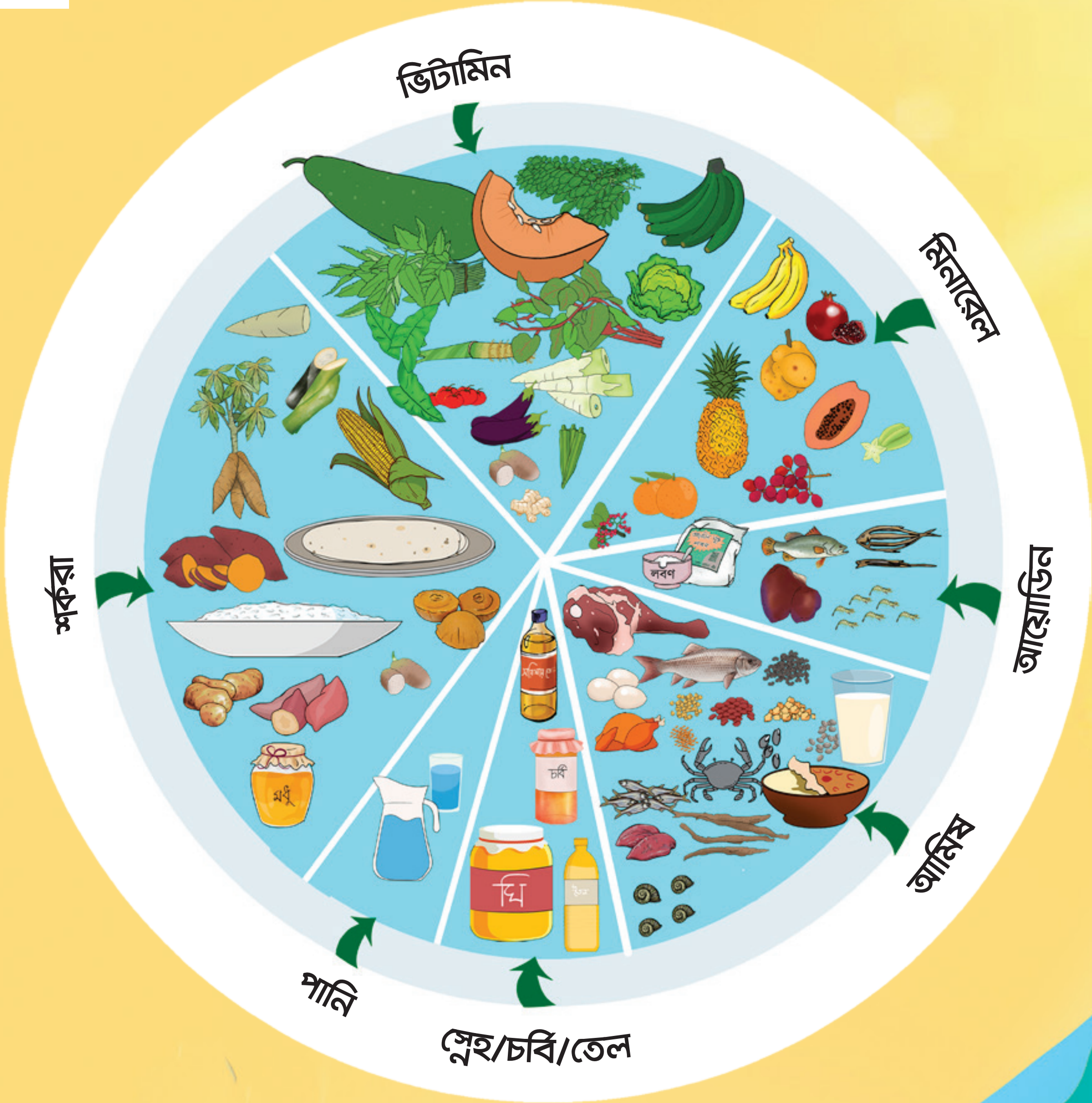

রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায়
ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে পরিচালিত
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন-এর অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পার্বত্য
চট্টগ্রামে সহনশীল জীবিকার জন্য সহায়তা (**PRLC**) প্রকল্পের
পুষ্টিসচেতনতা কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য ফ্লিপচার্ট

ফ্লিপচার্ট ব্যবহারের পদ্ধতি

ফ্লিপচার্ট ব্যবহারের আগে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর পরিষ্কার ধারণা পেতে ছবিগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট বক্তব্য ভালোভাবে পড়ে নিন

এই ফ্লিপচার্টের উদ্দেশ্য

- সচেতনতা বৃদ্ধিতে দলীয় আলোচনায় এই ফ্লিপচার্টটি ব্যবহার করা হবে, যার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় নারী ও পুরুষ উভয়ের সাথে খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য বিনিময় করা সম্ভব হবে।
- অংশগ্রহণকারীদের আচরণ পরিবর্তনে যোগাযোগের ক্ষেত্রে শিক্ষা উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

কোথায় ব্যবহার করবেন

- রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান জেলার অধিবাসীদের জন্য 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন'-এর Partnership for Resilient Livelihoods in CHT Region (PRLC) প্রকল্পের পুষ্টিসচেতনতা কার্যক্রমের উঠান বৈঠকে/দলীয় আলোচনায় ব্যবহারের জন্য এই ফ্লিপচার্টটি তৈরি করা হয়েছে।

কীভাবে আলোচনা করবেন

- আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের সময় মুখোমুখি এবং দলীয় আলোচনার সময় অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে 'U' আকৃতিতে আরামদায়ক স্থানে বসুন।
- দলীয় আলোচনার সময় বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে একই বয়স এবং সামাজিক মর্যাদার নারী ও পুরুষদের প্রাধান্য দিন।
- নির্বাচিত বিষয় সম্পর্কে কে, কী জানেন, তা জানতে চেষ্টা করুন এবং ফ্লিপচার্টের ছবি দেখিয়ে ছবির বিষয় সম্পর্কে সবার মতামত জিজ্ঞেস করুন।
- প্রত্যেককে মতপ্রকাশের সমান সুযোগ সৃষ্টি করে দিন।
- আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মতামতের সারসংক্ষেপ তৈরি করুন।
- বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।
- দৃশ্যমান ছবি/তথ্য সম্পৃক্ত করে আলোচনার মূল তথ্য ও উদাহরণ উপস্থাপন করুন।
- উপস্থাপনার সাথে সাথে অংশগ্রহণকারীদের মূল তথ্য ও উদাহরণ উপস্থাপন করুন।
- উপস্থাপনার সাথে সাথে অংশগ্রহণকারীদের বিশ্বাস, অভ্যাস, শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার কথা আলোচনা করুন।
- উপস্থিত আলোচকদের ইতিবাচক মন্তব্যগুলো ব্যবহার করে অন্যদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করুন।
- আলোচনার সূত্র ধরে উপস্থিত সবার প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা জানতে চান।
- আলোচনা শেষ করার পূর্বে সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করুন।

অবশ্যপালনীয় বিষয়সমূহ

- শুভেচ্ছা দিয়ে শুরু করুন এবং অংশ নেওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান।
- অভিনন্দন দিয়ে শেষ করুন এবং অংশ নেওয়ার জন্য সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন।
- আলোচনা শেষে ৩টি প্রশ্নের উত্তর জেনে নিন :
  ১) আজকের আলোচনায় আমরা নতুন কী জানলাম?
  ২) এই তথ্য আমাদের কী কাজে লাগবে?
  ৩) আমরা কীভাবে এই ফ্লিপচার্টে বর্ণিত তথ্যসমূহকে খাদ্য ও পুষ্টিগত দৈনন্দিন সমস্যার সমাধানে ব্যবহার করব?

আলোচনাকালে লক্ষণীয়

- কোনো অবস্থাতেই একনাগাড়ে ৫ মিনিটের বেশি বক্তব্য রাখবেন না।
- প্রত্যেকের চোখ-মুখ লক্ষ্য করুন এবং আলোচনায় তাদের মনোযোগের বা অংশগ্রহণের ব্যাপারে নিশ্চিত হোন।
- অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পারস্পরিক সৌজন্য বিনিময় এবং সহনশীলতা লক্ষ্য করুন, যেন কেউ কারও দ্বারা বিব্রত না হয়।
- অংশগ্রহণকারীদের মাঝে উৎসাহ সৃষ্টির ব্যাপারে নিশ্চিত হোন, প্রয়োজনে আলোচনার কৌশল বদলান।

সমন্বয় ও সম্পাদনায়

বনশ্রী মিত্র নিয়োগী, পরিচালক-রাইটস অ্যান্ড গভর্ন্যান্স কর্মসূচি, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন । **নিখিল চাকমা**, প্রকল্প সমন্বয়ক, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
রিমি চাকমা, টেকনিক্যাল অফিসার (নিউট্রিশন), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন । **নুসরাত জাবীন বিভা**, মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন অফিসার, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন

রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে পরিচালিত
মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন-এর অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে সহনশীল জীবিকার জন্য সহায়তা (PRLC) প্রকল্পের পুষ্টিসচেতনতা কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য ফ্লিপচার্ট

প্রকাশক : **মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন**, প্লট ৩ ও ৪, এভিনিউ ৩, হাজী রোড (শিয়ালবাড়ী ঢাল), রূপনগর, মিরপুর, ঢাকা ১২১৬, বাংলাদেশ । ফোন : +৮৮-০২-৫৮০৫৩১৯১-৯৮ । ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৫৮০৫৩১৯০

প্রকাশকাল : **ফেব্রুয়ারি ২০২৫**

সূচিপত্র

সেশন ১ : খাদ্য এবং পুষ্টি

সাব-টপিক ১ : খাদ্য এবং পুষ্টির সংজ্ঞা ০৪
সাব-টপিক ২ : খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ ০৬
সাব-টপিক ৩ : মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা অণুপুষ্টির গুরুত্ব ০৮
সাব-টপিক ৪ : বিভিন্ন প্রকার খাবারের উপাদান, উৎস এবং কাজ ১০
সাব-টপিক ৫ : সুষম খাবার ১২

সেশন ২ : খাদ্য বৈচিত্র্যতা

সাব-টপিক ১ : ফুড পিরামিড ১৪
সাব-টপিক ২ : ১০টি খাদ্যগোষ্ঠী/ফুড গ্রুপ ১৬
সাব-টপিক ৩ : বাড়ির আঙিনায় সবজি বাগান ১৮

সেশন ৩ : অপুষ্টি

সাব-টপিক ১ : অপুষ্টির সংজ্ঞা, কারণ ও শ্রেণিবিভাগ ২০
সাব-টপিক ২ : অপুষ্টিজনিত রোগ, লক্ষণ ও প্রতিরোধে করণীয় ২২
সাব-টপিক ৩ : অপুষ্টি এবং পুষ্টি চক্র ২৪

সেশন ৪ : কৈশোরকালীন শারীরিক, মানসিক পরিবর্তন এবং পরিচ্ছন্নতা ও পুষ্টি

সাব-টপিক ১ : শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন এবং কারণ ২৬
সাব-টপিক ২ : কৈশোরকালে কোন কোন খাবার শরীরে কোন কোন ধরনের উপকার করে ২৮

সেশন ৫ : মাসিককালীন স্বাস্থ্য ও ব্যবস্থাপনা

সাব-টপিক ১ : মাসিকের সংজ্ঞা ও এ সময়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য করণীয় ৩০
সাব-টপিক ২ : মাসিককালীন পুষ্টিকর খাবার এবং প্রচলিত ভুল ধারণা ৩২

সেশন ৬ : বয়ঃসন্ধিকালে কিশোরদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

সাব-টপিক ১ : স্বপ্নদোষ ও ব্যক্তিগত ও যৌনাঙ্গের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও যত্নে করণীয় ৩৪

সেশন ৭ : গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়ের পুষ্টি এবং যত্ন

সাব-টপিক ১ : গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়ের যত্ন ও পুষ্টি ৩৬
সাব-টপিক ২ : গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়ের খাবার তালিকা ৩৮
সাব-টপিক ৩ : গর্ভকালীন ও প্রসব-পরবর্তী সেবা (এএনসি ও পিএনসি) ৪০

সেশন ৮ : নবজাতকের পুষ্টি ও শালদুধ

সাব-টপিক ১ : শালদুধ ও মায়ের দুধের উপকারিতা ৪২
সাব-টপিক ২ : নবজাতকের ৬টি বিপদচিহ্ন ৪৪

সেশন ৯ : এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং (শুধুই বুকের দুধ পান করানো) ও সঠিকভাবে বুকের দুধ খাওয়ানোর উপায়

সাব-টপিক ১ : এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং বা শুধুই বুকের দুধ পান করানো ৪৬
সাব-টপিক ২ : মায়ের বুকের দুধ পান করানোর উপযোগী আচরণসমূহ ৪৮

সেশন ১০ : শিশুর বাড়তি খাবার

সাব-টপিক ১ : শিশুর বাড়তি খাবার কী, প্রয়োজনীয়তা ও এই খাবার দেওয়ার সময় লক্ষণীয় বিষয়সমূহ ৫০
সাব-টপিক ২ : সঠিক বয়স অনুযায়ী বাড়তি খাবারের তালিকা ৫২

সেশন ১১ : পুষ্টিকর খাবার তৈরির নিয়মাবলি

সাব-টপিক ১ : পুষ্টিগুণ বজায় রেখে খাবার রান্নার পদ্ধতি এবং সুষম খাদ্য নির্বাচন ও ক্রয় ৫৪
সাব-টপিক ২ : রান্নায় তেল ও লবণের ব্যবহার ৫৬
সাব-টপিক ৩ : স্বাস্থ্যসম্মতভাবে হাত ধোয়ার নিয়মাবলি ৫৮

সেশন ১২ : বাল্যবিয়ে এবং জেন্ডার ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা

সাব-টপিক ১ : বাল্যবিয়ে এবং এর কুফল ৬০
সাব-টপিক ২ : জেন্ডার ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা ৬২
সাব-টপিক ৩ : জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার কুফল ৬৪

সাব-টপিক ১ : খাদ্য এবং পুষ্টির সংজ্ঞা

খাদ্য

খাদ্য হচ্ছে খাবার উপযোগী তরল, নরম বা কঠিন সেই সকল জৈব উপাদান, যা মানবদেহ গঠনে ভূমিকা রাখে, ক্ষয়পূরণ করে, শক্তি বৃদ্ধিসহ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে। অর্থাৎ, দেহকে সুস্থ, সবল, কর্মক্ষম ও রোগমুক্ত রাখার জন্য মানুষ যা খায় তাই খাদ্য। আমরা খাদ্য থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে থাকি।

পুষ্টি

পুষ্টি হলো একটি প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়াতে খাদ্যবস্তু খাওয়ার পরে পরিপাক হয় এবং জটিল খাদ্য উপাদানগুলো ভেঙে সরল উপাদানে পরিণত হয়। মানবদেহ এসব সরল উপাদান শোষণ করে নেয়। এসব খাদ্য উপাদান মানবদেহের শক্তি ও যথাযথ বৃদ্ধি নিশ্চিত করে, মেধা ও বুদ্ধি বাড়ায়, রোগ প্রতিরোধ করে, রোগ-ব্যাধি থেকে তাড়াতাড়ি সুস্থ হতে সাহায্য করে এবং সর্বোপরি দেহকে কর্মক্ষম রাখে।

পুষ্টিকর খাদ্য

যেসব খাদ্য খেলে শরীরে তাপ ও শক্তি উৎপাদিত হয়, দেহের গঠন ও বৃদ্ধি হয়, শরীর সবল, কর্মক্ষম থাকে তাকে পুষ্টিকর খাদ্য বলে। খাদ্য ও পুষ্টি একে অপরের সাথে জড়িত। প্রতিটি খাদ্য অবশ্যই পুষ্টিকর ও নিরাপদ হতে হবে। নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করলে শরীর ও মন ভালো থাকে, মনে প্রফুল্লতা আসে এবং পড়াশোনা ও কাজে মনোযোগ বাড়ে। মনে রাখতে হবে, পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ না করলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং শরীরে বিভিন্ন ধরনের রোগ হয়।

সাব-টপিক ১ : খাদ্য এবং পুষ্টির সংজ্ঞা

শক্তিদায়ক খাবার (শর্করা ও স্নেহ বা চর্বি/তেল)

শরীর বৃদ্ধিকারক ও ক্ষয়পূরক খাবার (আমিষ)

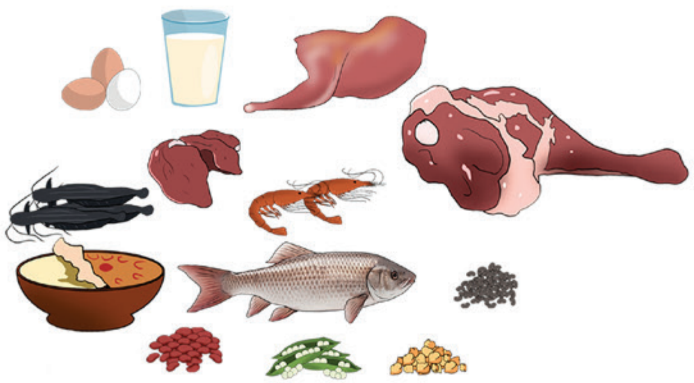

রোগ প্রতিরোধক ও সুরক্ষাকারী খাবার (ভিটামিন ও মিনারেল)

পরিশ্রম করলে জীবনের সমৃদ্ধি
শক্তিদায়ক খাবার তারই চাবিকাঠি

দেহের সঠিক বিকাশ নিশ্চিত করতে
শরীর বৃদ্ধিকারক ও ক্ষয়পূরক খাবার হবে খেতে

নিরোগ সুস্থ জীবন পেতে
রোগ প্রতিরোধক ও সুরক্ষাকারী খাবার হবে খেতে

সাব-টপিক ২ : খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ

খাদ্যের মধ্যে থাকা পুষ্টি উপাদানগুলোকে আমরা ৬টি ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন :

১. শর্করা বা শ্বেতসার

২. আমিষ

৩. ভিটামিন

৪. স্নেহ বা চর্বি/তেল

৫. মিনারেল/খনিজ লবণ

৬. পানি

একই খাদ্যে আবার একাধিক পুষ্টি উপাদান থাকতে পারে। আমরা প্রতিদিন যে খাদ্য গ্রহণ করি, তাকে কাজের ধরন অনুযায়ী সাধারণত ৩ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন :

১. শক্তিদায়ক খাবার (শর্করা ও স্নেহ বা চর্বি/তেল)

২. শরীর বৃদ্ধিকারক ও ক্ষয়পূরক খাবার (আমিষ)

৩. রোগ প্রতিরোধক ও সুরক্ষাকারী খাবার (ভিটামিন ও মিনারেল)

সাব-টপিক ২ : খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ

পুষ্টি উপাদানসমূহ

শর্করা বা শ্বেতসার

আমিষ

ভিটামিন

স্নেহ বা চর্বি/তেল

পানি

মিনারেল/খনিজ লবণ

কাজের ধরন অনুযায়ী খাদ্য

শক্তিদায়ক খাবার (শর্করা ও স্নেহ বা চর্বি/তেল)

শরীর বৃদ্ধিকারক ও ক্ষয়পূরক খাবার (আমিষ)

রোগ প্রতিরোধক ও সুরক্ষাকারী খাবার (ভিটামিন ও মিনারেল)

সাব-টপিক ৩: মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা অণুপুষ্টির গুরুত্ব

খাদ্যে উপস্থিত ৬টি উপাদানকে দেহে পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন :

১. প্রধান পুষ্টি উপাদান বা ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট (শর্করা, আমিষ, স্নেহ/তেল, পানি)

২. মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা অণুপুষ্টি (ভিটামিন ও মিনারেল)

ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা প্রধান পুষ্টি উপাদানের গুরুত্ব

আমাদের শরীরে প্রধান পুষ্টি উপাদানের দরকার হয় বেশি। এগুলো ক্যালরির আকারে আমাদের শরীরে শক্তি জোগায়, যা বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য। শরীর সুস্থ রাখতে, রোগ প্রতিরোধ করতে এবং নতুন টিস্যু তৈরি করতে প্রধান পুষ্টি উপাদানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা অণুপুষ্টি উপাদানের গুরুত্ব

সুস্থ থাকার জন্য অণুপুষ্টি উপাদানের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও খুবই অল্প পরিমাণে প্রয়োজন, এ উপাদান শারীরিক এবং মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে দেহকে সুরক্ষা করে।

সাব-টপিক ৩ : মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা অণুপুষ্টির গুরুত্ব

ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা প্রধান পুষ্টি উপাদান
শর্করা, আমিষ, স্নেহ/তেল, পানি

মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা অণুপুষ্টি
ভিটামিন ও মিনারেল

সাব-টপিক ৪ : বিভিন্ন প্রকার খাবারের উপাদান, উৎস এবং কাজ

আসুন জেনে নেই, কোন খাদ্যের কী কাজ এবং সেগুলো আমরা কোথা থেকে পেতে পারি

পুষ্টি উপাদান	কাজ	উৎস	অপুষ্টিজনিত সমস্যা
শর্করা	● তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করে দেহকে কর্মক্ষম রাখে ● এ জাতীয় খাদ্যের আঁশ কোষ্ঠকাঠিন্য এবং মলাশয়ের ক্যান্সার প্রতিরোধ করে	পূর্ণশস্য জাতীয় খাদ্য – চাল, গম, ভুট্টা, কাসাভা, জুম আলু, মিষ্টি আলু, আলু, চিনি, মধু, গুড়, সুজি, সাবু দানা ইত্যাদি	● কর্মক্ষমতা কমে যায় ● পেশি ও হাড়ের ঘনত্ব হ্রাস পায় ● কোষ্ঠকাঠিন্য ও মলাশয়ে ক্যান্সার হয় ● অতিরিক্ত চর্বি গ্রহণ করলে চর্বি শরীরে জমা হয়ে স্থূলতা তৈরি করে, ফলে বিভিন্ন ধরনের অসংক্রামক রোগ হয়
আমিষ	শরীরের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধন করে	প্রাণিজ: মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, শুঁটকি, কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক উদ্ভিজ্জ: বিভিন্ন প্রকার ডাল, সয়াবিন, মটরশুঁটি, বিচি-জাতীয় খাদ্য, বিভিন্ন প্রকার বাদাম ইত্যাদি	- দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া/ খাটো হওয়া বা বামনত্ব - ওজন হ্রাস বা কৃশকায় - এডেমা (ত্বকের নিচে পানি যাকে কোয়াশিয়রকর বলে) - চুল ও নখ ভেঙে যাওয়ার প্রবণতা
ভিটামিন	এ উপাদান দেহকোষের শর্করা, স্নেহ/চর্বি, আমিষ ইত্যাদির রাসায়নিক বিক্রিয়াতে (বিপাকে) সহায়তা করে দেহকে রোগ সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে	গাঢ় সবুজ রং-এর শাকসবজি, হলুদ, কমলা রঙের সবজি ও ফলমূল, যেমন : পালংশাক, পুঁইশাক, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, গাজর, বিট, পাকা আম, পাকা পেঁপে, কাঁঠাল, রাঙা জুম আলু, রকসকো, পাকা বেগুন, বাঁশকোড়ল, টক ফল, ঢেঁকিশাক, শজনে শাক, আদা ফুল, হলুদের ফুল, মিষ্টি কুমড়া ফুল, শিম, শিমুল ফুল ইত্যাদি	ভিটামিন-'এ' : রাতকানা, চক্ষুশুষ্কতা ভিটামিন-'ডি' : রিকেট, অস্টিও-ম্যালেশিয়া ভিটামিন-'ই' : প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস, অকাল বার্ধক্য, হাত-পায়ের অসারতা, স্নায়ুরোগ, ক্রমাগত দুর্বলতা ভিটামিন 'কে' : রক্তক্ষরণ বন্ধ না হওয়া, পিত্তের স্বাভাবিক প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ বাধাগ্রস্ত হওয়া ভিটামিন 'বি' : রক্তস্বল্পতা দেখা দেওয়া, দেহকোষে শক্তি উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হওয়া ও চিলোসিস বা ঠোঁটের কোণায় ঘা হওয়া
স্নেহ/চর্বি/তেল	● শরীরে শক্তি প্রদান করে ● চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন 'এ', 'ডি', 'ই', 'কে'-এর শোষণ, সংবহন ও সংরক্ষণে সহযোগিতা করে তেল-চর্বি শরীরের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন অঙ্গ, যেমন : মগজ, স্নায়ু ও হরমোন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে	উদ্ভিজ্জ উৎস: সব ধরনের ভেজিটেবল অয়েল– সূর্যমুখী, সয়াবিন, সরিষা, তিল, বাদাম ইত্যাদির তেল প্রাণিজ উৎস : ঘি, মাখন, ক্রিম, ডিমের কুসুম, চর্বি, মাওয়া, মাছের তেল ইত্যাদি	- চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন 'এ', 'ডি', 'ই', 'কে'-এর অভাবজনিত লক্ষণ দেখা দেওয়া - অতিরিক্ত তেল-চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণের ফলে উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ স্থূলতা হওয়া
খনিজ লবণ বা মিনারেল	ঘাড়, দাঁত, নখ, রক্ত, স্নায়ু ও পেশীসহ দেহের বিভিন্ন অংশের টিস্যু গঠন করে দেহকে সুস্থ ও সবল করে	তাজা শাকসবজি ও ফলমূল– কচুশাক, শজনে শাক, মূলাশাক, পটল, কাঁকরোল, ফুলকপি, কাঁচা আম, পেঁপে, কলা (কাঁচা, পাকা) ইত্যাদি মৌসুমি ফল ও শাকসবজির সালাদ, সামুদ্রিক মাছ, শুঁটকি, শেওলা, আয়োডিনযুক্ত লবণ, ছোট মাছ, দুধ ইত্যাদি	রক্তস্বল্পতা, গলগণ্ড, স্মৃতি-ভ্রংশ, মানসিক প্রতিবন্ধিতা ও বিকলাঙ্গতা, ক্লান্তি ও অবসাদ, হাড় ও দাঁতের গঠন ব্যাহত হওয়া, পেশিতে ব্যথা ও খিঁচুনি হওয়া, হাড়ক্ষয় ও হাড়ের ঘনত্ব কমে যাওয়া, শরীরের অংশবিশেষ শক্ত হয়ে যাওয়া

সাব-টপিক ৪ : বিভিন্ন প্রকার খাবারের উপাদান, উৎস এবং কাজ

শর্করা

প্রাণিজ আমিষ

উদ্ভিজ্জ আমিষ

ভিটামিন জাতীয় খাবার

তেল-চর্বিজাতীয় খাবার

ক্যালসিয়াম

আয়রন

আয়োডিন

সাব-টপিক ৫ : সুষম খাবার

সুষম খাবারের প্রয়োজনীয়তা

সুষম খাবার তাকেই বলে, যে খাবারের তালিকায় সঠিক পরিমাণে সবগুলো প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান উপস্থিত থাকে। সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রতিদিন ৬ রকম খাদ্য উপাদানসমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করতে হয়।

সুষম খাবার তৈরির কৌশল

সহজে পাওয়া যায় ও দামে সস্তা বিভিন্ন ধরনের খাদ্য দিয়েও সুষম খাবার তৈরি করা যায়। কতগুলো নিয়ম মেনে একটি সুষম খাদ্য তালিকা তৈরি করতে হয়। সুষম খাদ্য পেতে হলে কাজ অনুযায়ী নিম্নোক্ত ৩ শ্রেণির খাদ্যের সমন্বয় ঘটাতে হবে :

১. শক্তিদায়ক খাবার (শর্করা ও স্নেহ বা চর্বি/তেল)

২. শরীর বৃদ্ধিকারক ও ক্ষয়পূরক খাবার (আমিষ)

৩. রোগ প্রতিরোধক ও সুরক্ষাকারী খাবার (ভিটামিন ও মিনারেল)

কোন ধরনের খাবার কতখানি খেতে হবে তা বোঝার সহজ উপায় ফুড পিরামিড।

সাব-টপিক ৫ : সুষম খাবার

সাব-টপিক ১ : ফুড পিরামিড

স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণকে সহজ করার জন্য খাদ্য পিরামিডের নকশা করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ বলতে সুস্বাস্থ্য রক্ষায় প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান (আমিষ, স্নেহ/তেল, শর্করা, ভিটামিন এবং খনিজ) সঠিক পরিমাণে গ্রহণকে বোঝায়। একই ধরনের পুষ্টিমানের খাবারগুলোকে খাদ্য পিরামিডের একেক স্তরে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের জন্য খাদ্যতালিকা বানানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন খাবার বেছে নেয়ার সুযোগ থাকে।

শস্যজাতীয় খাদ্য এই পিরামিডের ভিত্তি, যা চাহিদামত গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। পিরামিডের শীর্ষে চিনিজাত পণ্য এবং তেল ও চর্বির কথা বলা হয়েছে, যা অল্প পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, এসব খাদ্য খুব অল্প পরিমাণে দেহের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং খনিজের জোগান দেয়। খাদ্য পিরামিডের ওপরের অংশ সাধারণত এদের নিয়ে গঠিত। পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের জন্য এদের গ্রহণ সীমিত করা অপরিহার্য।

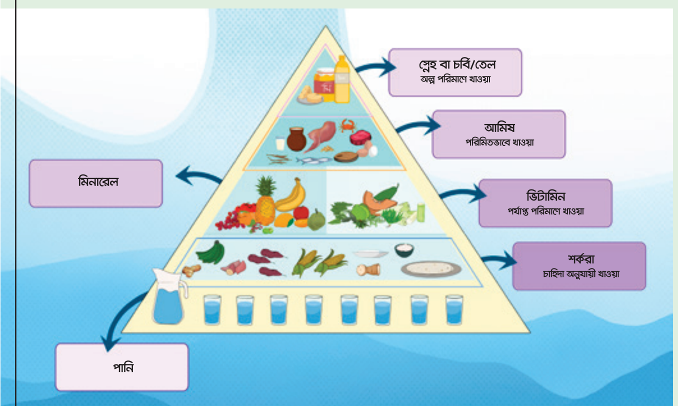

খাদ্য বৈচিত্র্য

শাকসবজি, ফলমূল, শস্যদানা, মাছ, মাংস, দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যদ্রব্যের মতো বিস্তৃত বিভিন্ন ধরনের খাবারকে খাদ্যের বৈচিত্র্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়। বৈচিত্র্যময় খাদ্যাভ্যাস আমাদের যেকোনো একটি পুষ্টির ওপর অযথা নির্ভরশীল হতে বাধা দেয়, যা শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট খাবারের মাধ্যমে পাওয়া যায়। শুধু যে দামি খাবারই পুষ্টির ভালো উৎস তা নয়, কম দামি খাবারেও পর্যাপ্ত পুষ্টি থাকতে পারে।

বৈচিত্র্যপূর্ণ খাবারের উপকারিতা

- খাদ্য বৈচিত্র্য সম্পূর্ণ পুষ্টি নিশ্চিত করে।
- বিভিন্ন ধরনের খাবার খাওয়ার ফলে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যকর খাবারের সবধরনের পুষ্টি পাওয়া যায়।
- বৈচিত্র্যময় খাবার বিভিন্ন ম্যাক্রো অথবা প্রধান পুষ্টি উপাদান এবং মাইক্রো অথবা অণুপুষ্টি উপাদানের একটি ভালো উৎস, যা পুষ্টির পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করে।
- বৈচিত্র্যপূর্ণ খাবার খাওয়ার মাধ্যমে আমাদের বিভিন্ন ভিটামিন, মিনারেল/খনিজ পুষ্টি এবং ফাইটোকেমিক্যাল পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, যা পুষ্টির ঘাটতি এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগ/অসংক্রামক রোগ, যেমন : ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ ও হৃদরোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে।
- মা ও শিশুর ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি সাধনে সহায়তা করে।
- মা ও শিশুকে অপুষ্টির হাত থেকে রক্ষা করে।
- শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তা করে।

সাব-টপিক ১ : ফুড পিরামিড

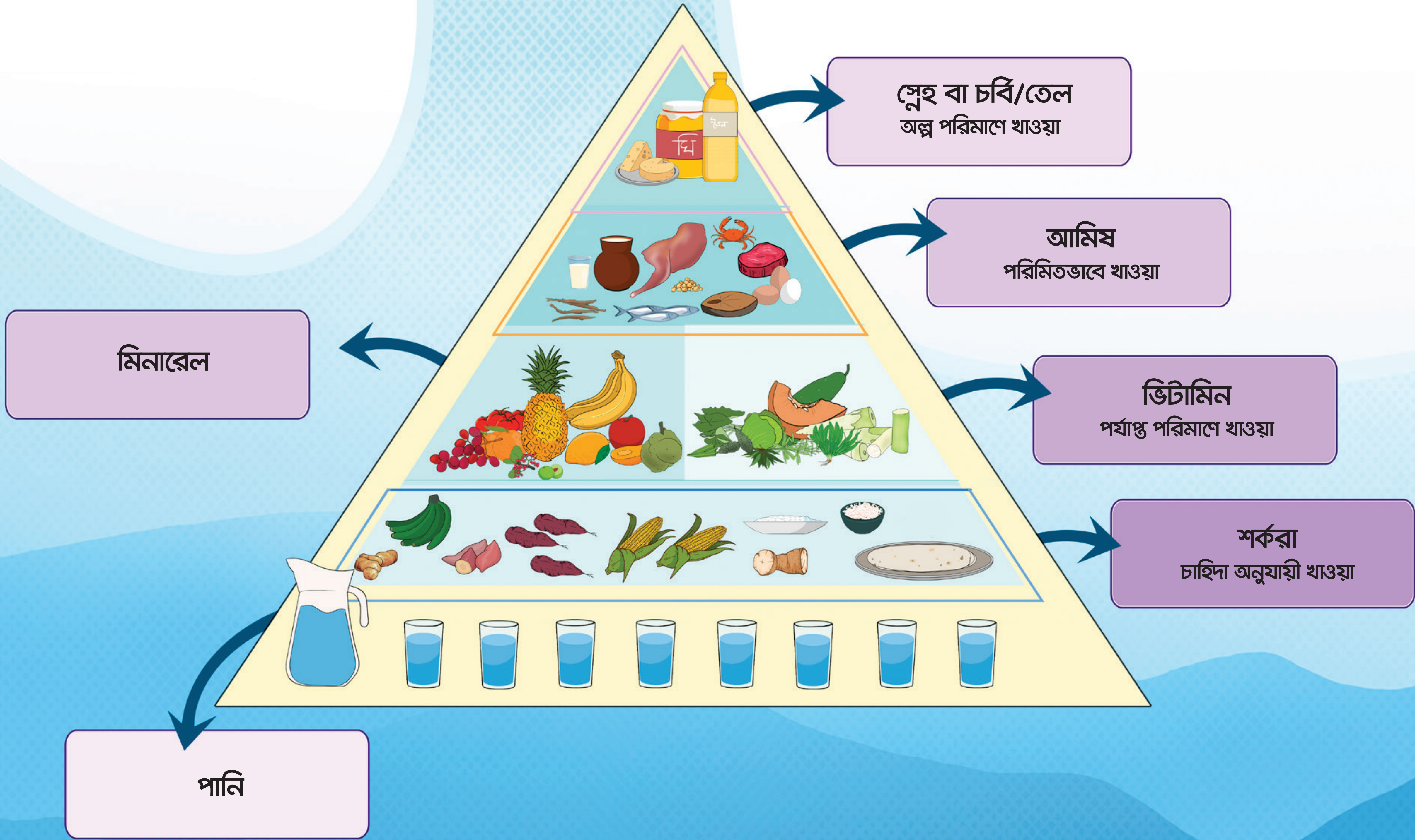

সাব-টপিক ২ : ১০টি খাদ্যগোষ্ঠী/ফুড গ্রুপ

যে ১০ ধরনের খাদ্য থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানগুলো পাওয়া যেতে পারে

শস্য, মূল বা কন্দজাতীয় খাদ্য : ভাত, রুটি, চিড়া, মুড়ি, আলু, মিষ্টি আলু, কাসাভা, ঝুম আলু, কচুরমুখী, বাজরা

ডাল ও ডালজাতীয় খাদ্য : মুসুরি, মুগ, বুটের ডাল, মটরশুঁটি, কলাই, হেলেন ডাল, রাজমা, শিমের বিচি, কাঁঠালের বিচি এবং অন্যান্য আঞ্চলিকভাবে প্রাপ্ত বিচি ও ডাল

বাদাম ও বীজজাতীয় খাদ্য : চীনাবাদাম, কাঠবাদাম, পেস্তা বাদাম, কাজু বাদাম ইত্যাদি

দুগ্ধজাতীয় খাদ্য : দুধ, দই, ছানা, পনির, মিষ্টি, পায়েশ, পুডিং, সেমাই ইত্যাদি

মাছ-মাংসজাতীয় খাদ্য : ছোট, বড় মাছ, সামুদ্রিক মাছ, হাঁস-মুরগির মাংস, কলিজা, গরু/খাসি/পাঠা/গুঁই সাপের মাংস, পাখির মাংস ইত্যাদি

ডিমজাতীয় খাদ্য : হাঁসের ডিম, মুরগির ডিম, কোয়েল ও অন্যান্য পাখির ডিম

ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ ফল ও সবজি : পাকা পেঁপে, আম, কাঁঠাল, খেজুর, গাজর, মিষ্টি কুমড়া, ফুলকপি, টমেটো ইত্যাদি

ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ খাদ্য : আমড়া, পেয়ারা, জাম্বুরা, জলপাই, আমলকি, কলা ইত্যাদি

অন্যান্য সবজি : লাউ, ঝিঙা, চিচিঙ্গা, মুলা, বাঁধাকপি, ডাটা, লতি, পটল, কাঁকরোল ইত্যাদি

তেল/চর্বিজাতীয় খাদ্য : ঘি, মাখন, ক্রীম, মাছের তেল, সরিষার তেল, সয়াবিন তেল, সূর্যমুখীর তেল ইত্যাদি

**এই ১০টি খাদ্যগ্রুপ থেকে একজন নারী বা পুরুষের অন্ততপক্ষে
৪টি গ্রুপের খাবার খেতে হবে।**

সাব-টপিক ২ : ১০টি খাদ্যগোষ্ঠী/ফুড গ্রুপ

শস্য, মূল বা কন্দজাতীয় খাদ্য

ডাল ও ডালজাতীয় খাদ্য

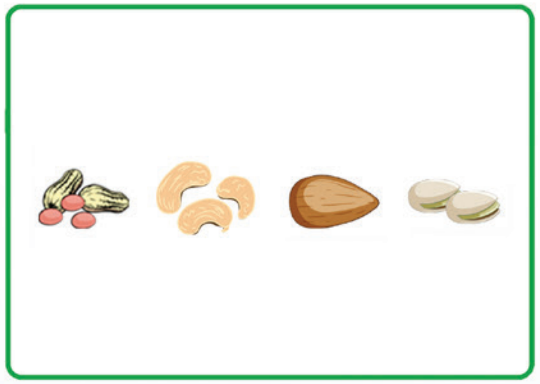

বাদাম ও বীজজাতীয় খাদ্য

দুগ্ধজাতীয় খাদ্য

মাছ-মাংসজাতীয় খাদ্য

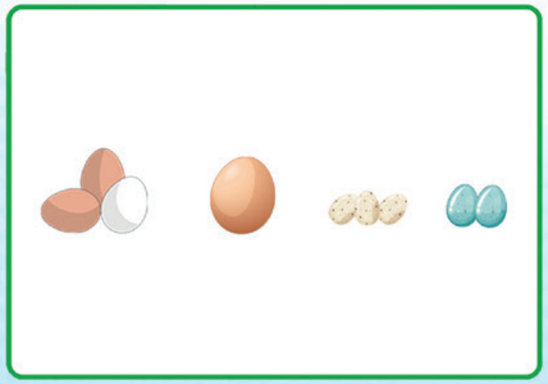

ডিমজাতীয় খাদ্য

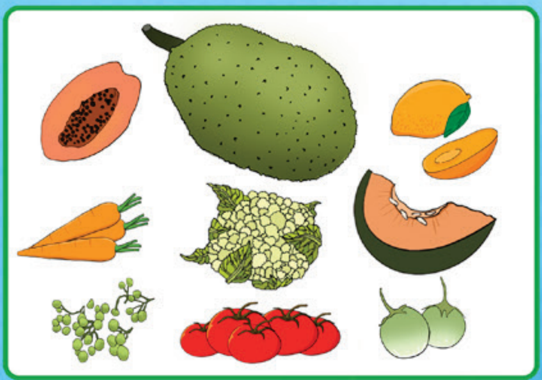

ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ ফল ও সবজি

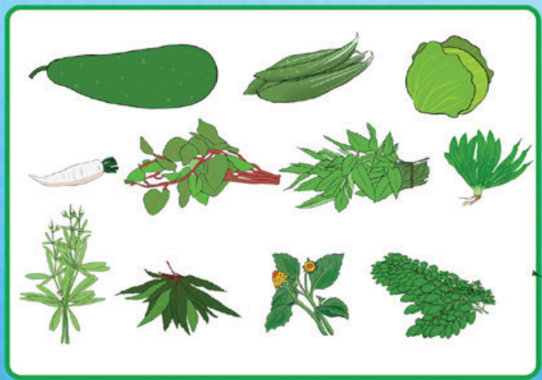

ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ খাদ্য

অন্যান্য সবজি

তেল/চর্বিজাতীয় খাদ্য

সাব-টপিক ৩ : বাড়ির আঙিনায় সবজি বাগান

বাড়ির আঙিনায় সবজি বাগান

বাড়ির আঙিনায় ছোট পরিসরে বা পতিত জমিতে বছরব্যাপী বিভিন্ন প্রকারের শাক (লালশাক, কলমি শাক, লাউ শাক, কুমড়া শাক), সবজি (করলা, মরিচ, বেগুন, টমেটো, শসা ইত্যাদি), ফল গাছ (কলা, পেঁয়ারা, পেঁপে), মসলা ও ঔষধি গাছ লাগিয়ে যে বাগান সৃষ্টি করা হয় তাকে হোমেস্টেড গার্ডেন বা গৃহস্থালি বাগান বলে। এ বাগান সারাবছর পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বাড়তি আয়েরও সুযোগ সৃষ্টি করে।

সাব-টপিক ৩ : বাড়ির আঙিনায় সবজি বাগান

সাব-টপিক ১ : অপুষ্টির সংজ্ঞা, কারণ ও শ্রেণিবিভাগ

অপুষ্টি কী?

প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত কিংবা অপর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে দেহে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে অপুষ্টি বলে। যেসব শিশু অপুষ্টিতে ভোগে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম এবং অন্যান্য রোগের সংক্রমণের ঝুঁকিও বেশি। তারা প্রায়শই একাগ্রতার সমস্যায় ভোগে এবং কোনো কিছুতে বেশি মনোযোগ দিতে পারে না। ফলে তাদের শিক্ষা ও স্বাভাবিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অপুষ্টির কারণ

খাদ্যের যে পুষ্টি উপাদানগুলো সম্পর্কে পূর্বে আমরা কথা বলেছি সেগুলো যথাযথ পরিমাণে না খাওয়ার ফলে শরীরে যে পুষ্টির ঘাটতি দেখা দেয়, তার ফলে বিভিন্ন অসুখ-বিসুখ ও সমস্যা দেখা দেয়। নিচে অপুষ্টির কিছু কারণ উল্লেখ করা হলো :

- সঠিক পুষ্টিজ্ঞানের অভাব
- সুষম খাদ্যের অভাব
- অণুপুষ্টির ঘাটতি
- চিপস, কোমল পানীয় ইত্যাদি জাঙ্ক ফুড খাওয়া
- দারিদ্র্য ও শ্রেণিবৈষম্য
- বেকারত্ব
- কুসংস্কার
- বাল্যবিয়ে ও অকাল গর্ভধারণ
- জেন্ডারবৈষম্য

অপুষ্টির শ্রেণিবিভাগ

অপুষ্টিকে প্রধানত ২ ভাগে ভাগ করা যায়, যথা :

কম পুষ্টি (খর্বকায়তা বা কৃশকায়তা)

অপর্যাপ্ত সেবা ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ, ঘন ঘন রোগ সংক্রমণ এবং সুষম খাবার না গ্রহণের কারণে কম পুষ্টি দেখা দেয়। অপুষ্টি দীর্ঘস্থায়ী হয়ে বৃদ্ধি এবং বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করার মাধ্যমে মানুষকে প্রতিবন্ধিত্বের দিকে ঠেলে দিতে পারে, যা 'খর্বকায়' নামে পরিচিত। অপুষ্টির কারণে অনেকে বেশিমাত্রায় পাতলা হয়ে যেতে পারে, যা 'কৃশকায়' নামে পরিচিত। এ অবস্থায় সব রকমের পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি দেখা দেয়। প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান, যেমন : আমিষ, শর্করা, স্নেহ/তেল, ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ ও মিনারেল বা খনিজ লবণ ইত্যাদি উপাদানের ঘাটতির কারণে অপুষ্টির লক্ষণ দেখা দেয়। কম পুষ্টির কারণেও রোগ সংক্রমণ বৃদ্ধি পায় এবং মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ে।

অতিপুষ্টি (স্থূলতা)

কম পুষ্টির অন্য পিঠে রয়েছে অতিরিক্ত ওজন এবং স্থূলতা যাকে 'স্থূলকায়'ও বলা হয়। প্রয়োজনের তুলনায় বেশি খাবার গ্রহণ এবং কম শারীরিক পরিশ্রমের কারণে এই ধরনের অপুষ্টির সমস্যা দেখা দেয়। অতিপুষ্টি ভবিষ্যতে শিশুদের হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস এবং অন্যান্য রোগসহ মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ায়।

সাব-টপিক ১ : অপুষ্টির সংজ্ঞা, কারণ ও শ্রেণিবিভাগ

সাব-টপিক ২ : অপুষ্টিজনিত রোগ, লক্ষণ ও প্রতিরোধে করণীয়

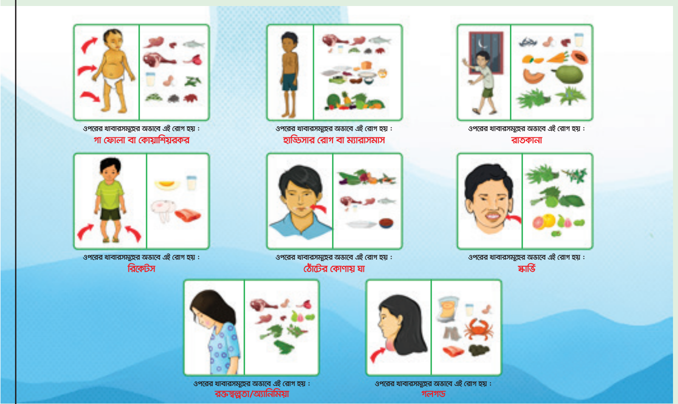

ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা প্রধান পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত রোগ, লক্ষণ ও প্রতিরোধে করণীয়

- **গা ফোলা বা কোয়াশিয়রকর** : শিশুর ১-৪ বছর বয়সে এ রোগ বেশি হয়।

লক্ষণ : ওজন কমে যাওয়া, চাঁদের মতো গোলাকার মুখ, চুলের রং পরিবর্তন ও পাতলা হওয়া, শরীরে পানি আসা।

প্রতিরোধ : আমিষ উপাদানসমৃদ্ধ খাবার, যেমন : মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার, বিভিন্ন প্রকার ডাল ও বিচি-জাতীয় খাবার গ্রহণ।

- **হাড্ডিসার রোগ বা ম্যারাসমাস** : শিশুর প্রথম ২ বছর বয়সে এ রোগ বেশি হয়।

লক্ষণ : অত্যাধিক ওজন কমে যায়, দেহ কৃষ্ণকায় এবং ত্বক চর্বিশূন্য হয়ে যায়, এবং রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়।

প্রতিরোধ : শর্করা ও আমিষের সাথে অন্যান্য পুষ্টি উপাদানসমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে।

মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা অণুপুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত রোগ, লক্ষণ ও প্রতিরোধে করণীয়

- **রাতকানা**

লক্ষণ : ❑ রাতের অল্প আলোতে দেখতে না পারা ❑ চোখ বন্ধ হয়ে যাওয়া ❑ চোখ জ্বালাপোড়া করা

প্রতিরোধ : ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ খাদ্য, যেমন : ছোট মাছ, দুধ, ডিম, কলিজা, তৈলাক্ত মাছ, হলুদ ও কমলা রং-এর ফল ও সবজি- পাকা পেঁপে, আম, কাঁঠাল, গাজর, মিষ্টিকুমড়া, গাঢ় সবুজ রং-এর শাক (আঞ্চলিকভাবে প্রাপ্ত ফলমূল ও শাকসবজি) তেল দিয়ে রান্না করে খাওয়া।

- **রিকেটস**

লক্ষণ : ❑ পায়ের অস্থি নরম ও হালকা হয়ে ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে যাওয়া ❑ বুকের পাঁজর চেপে যাওয়া

প্রতিরোধ : প্রতিদিন ভিটামিন 'ডি' সমৃদ্ধ খাবার, যেমন : ডিমের কুসুম, মাছের তেল, দুধ খাওয়ার পাশাপাশি কমপক্ষে ২০-৩০ মিনিট সূর্যের আলোতে থাকতে হবে।

- **ঠোঁটের কোণায় ঘা**

লক্ষণ : ❑ ক্লান্তি ও অবসাদ ❑ ঠোঁটের কোণায় ঘা বা ক্ষত

প্রতিরোধ : ভিটামিন বি সমৃদ্ধ খাবার, যেমন : তাজা শাকসবজি, মাংস, ডিম, দুধ, চাল, ডাল ইত্যাদি খাবার খাওয়া।

- **স্কার্ভি**

লক্ষণ : ❑ মাঢ়ী ফোলা ❑ মাঢ়ী দিয়ে রক্ত ঝরা

প্রতিরোধ : ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ খাবার, যেমন : তাজা শাকসবজি, সালাদ, টকজাতীয় ফল- পেয়ারা, আমড়া, আমলকি, লেবুজাতীয় আঞ্চলিকভাবে প্রাপ্ত বিভিন্ন ধরনের ফল খাওয়া।

- **রক্তস্বল্পতা/অ্যানিমিয়া**

লক্ষণ : ❑ গায়ের রং ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া ❑ ঠোঁট, জিহ্বা, হাতের তালু ও নখ ফ্যাকাশে বর্ণ ধারণ করা ❑ মাথা ঘোরানো ❑ অল্প পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়া

প্রতিরোধ : আয়রন সমৃদ্ধ খাবার, যেমন : কলিজা, মাংস, ডিম, কচুশাক, পুঁইশাক, শজনে পাতা, সঙ্গে ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ খাবার, যেমন : লেবু, পেয়ারা, আমড়া ইত্যাদি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ফলিক অ্যাসিড-সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া।

- **গলগণ্ড**

লক্ষণ : গলগন্ডের প্রাথমিক লক্ষণ হলো সাধারণত ঘাড়ে একটি লক্ষণীয় ফোলাভাব দেখা দেওয়া। অন্যান্য লক্ষণ হলো :
❑ গিলতে বা শ্বাস নিতে অসুবিধা হওয়া ❑ কাশি ❑ মাথার ওপরে হাত রাখলে মাথা ঘোরা ❑ কণ্ঠস্বর কর্কশ হয়ে যাওয়া

প্রতিরোধ : গলগণ্ড প্রতিরোধের জন্য খাবারের সঙ্গে আয়োডিনযুক্ত লবণ খেতে হবে। সাথে বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছ খাওয়া যেতে পারে।

সাব-টপিক ২ : অপুষ্টিজনিত রোগ, লক্ষণ ও প্রতিরোধে করণীয়

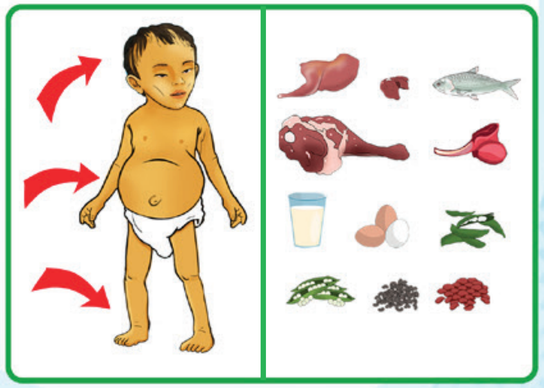

ওপরের খাবারসমূহের অভাবে এই রোগ হয় :

গা ফোলা বা কোয়াশিয়রকর

ওপরের খাবারসমূহের অভাবে এই রোগ হয় :

হাড্ডিসার রোগ বা ম্যারাসমাস

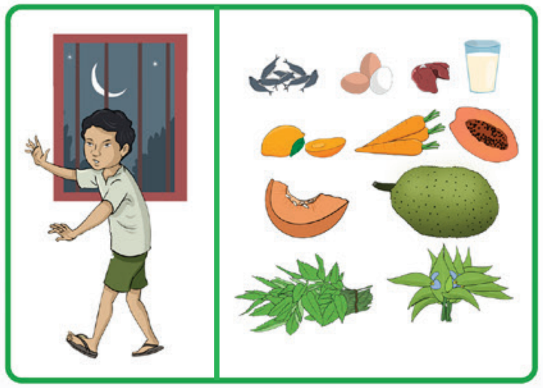

ওপরের খাবারসমূহের অভাবে এই রোগ হয় :

রাতকানা

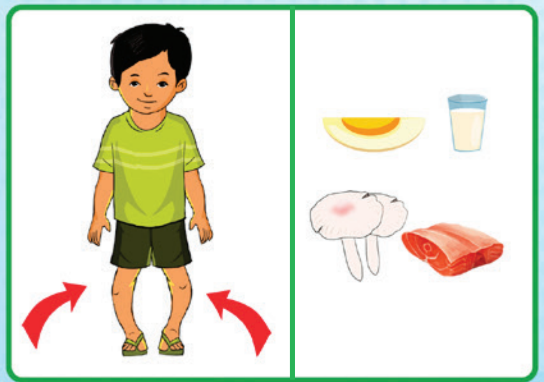

ওপরের খাবারসমূহের অভাবে এই রোগ হয় :

রিকেটস

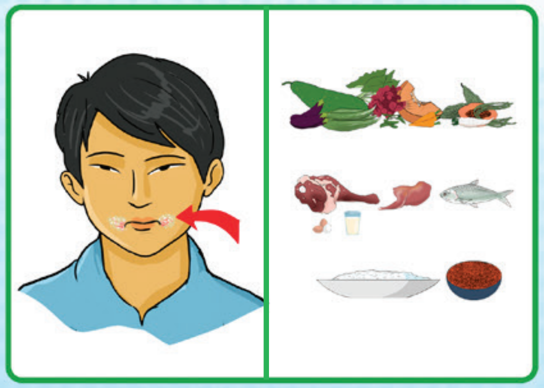

ওপরের খাবারসমূহের অভাবে এই রোগ হয় :

ঠোঁটের কোণায় ঘা

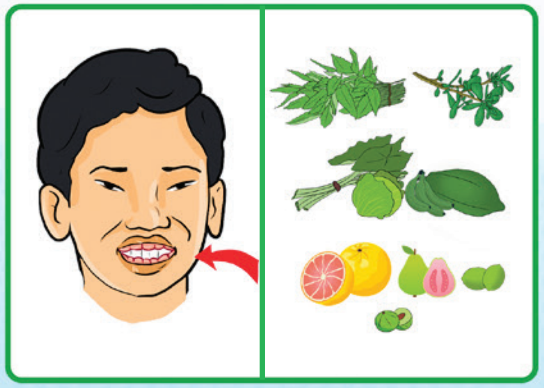

ওপরের খাবারসমূহের অভাবে এই রোগ হয় :

স্কার্ভি

ওপরের খাবারসমূহের অভাবে এই রোগ হয় :

রক্তস্বল্পতা/অ্যানিমিয়া

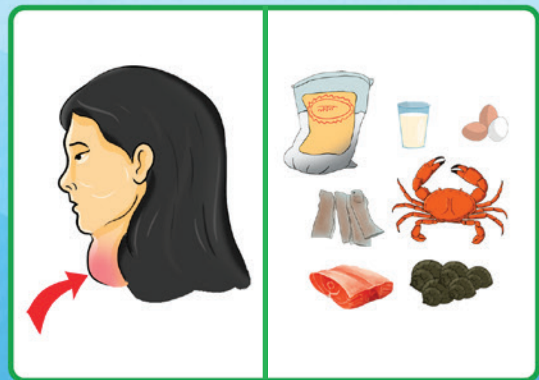

ওপরের খাবারসমূহের অভাবে এই রোগ হয় :

গলগন্ড

সাব-টপিক ৩ : অপুষ্টি এবং পুষ্টি চক্র

অপুষ্টি চক্র বা অপুষ্টির সম্ভাব্য ফলাফল

গর্ভধারণ থেকে শুরু করে ভ্রূণাবস্থা এমনকি নবজাতকের প্রাথমিক অবস্থা পর্যন্ত পুষ্টির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই, অপুষ্টি চক্র বংশ পরম্পরায় চলতে থাকে। পুষ্টিজনিত সমস্যায় ভোগা কিশোরীদের পর্যাপ্ত দৈহিক বৃদ্ধি না হওয়ায় তারা বেঁটে বা খাটো হয় এবং কম ওজনের শিশু জন্ম দিয়ে থাকে। আর এই কম ওজনের শিশুরা যদি মেয়ে হয়, তাহলে তারাও বড় হলে খাটো হয় এবং বিয়ে হলে আবারো কম ওজনের শিশু জন্ম দেয়, যা আরো ভয়াবহ। এভাবেই এই চক্র চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না এই চক্র ভাঙে। মেয়ে শিশুদের ঠিকমতো খাদ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান না করলে তারা খর্বাকৃতির হয়ে বাড়তে থাকে। পরবর্তীতে খর্বাকৃতির অপুষ্ট কিশোরী হিসেবে বেড়ে ওঠে। বিয়ের পরে সে একজন কম ওজনের মহিলা হিসেবে গর্ভধারণ করে, তার ফলে সে কম ওজনের শিশু জন্ম দেয়। সেই কম ওজনের মেয়ে শিশুকে সঠিক খাদ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা না দিতে পারলে সেও অপুষ্টিতে ভোগে এবং বিয়ের পর অপুষ্ট শিশু জন্ম দেয়, এভাবে মেয়েদের ভেতর অপুষ্টির চক্র ঘুরতে থাকে । তাই, এই অপুষ্টি চক্রকে ধ্বংস করতে হলে প্রয়োজন মেয়ে শিশুদের যথাযথ যত্ন এবং সঠিক পুষ্টি। একজন নারী যখন গর্ভবতী হবে তাকে যথাযথ সেবা দিতে হবে, পাশাপাশি তাকে পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে হবে, যাতে তার গর্ভের শিশু প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান লাভ করে গর্ভাবস্থায় সঠিকভাবে বিকশিত হতে পারে। এজন্য জীবনের সকল স্তরেই, বিশেষ করে শৈশব ও কৈশোরে পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের মাধ্যমে কিশোরী ও নারীদের পুষ্টি নিশ্চিত করতে হবে।

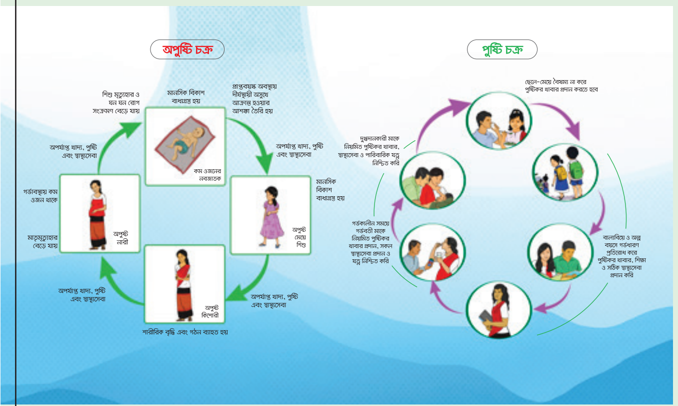

পুষ্টিচক্র

অপুষ্টি চক্রকে ধ্বংস করতে হলে সঠিক পুষ্টি এবং যথাযথ চিকিৎসা ও যত্ন নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে মেয়েশিশুদের প্রতি বাড়তি খেয়াল রাখতে হবে। জন্মের পরপরই শিশুকে শালদুধ পান করাতে হবে। পাশাপাশি সব ধরনের প্রয়োজনীয় টিকা দিতে হবে এবং যত্ন নিতে হবে। খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা, যত্ন এবং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে সন্তানের মধ্যে কোনো বৈষম্য করা যাবে না। কৈশোরে ছেলে-মেয়েদের সঠিক যত্ন নিতে হবে, যেন তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সঠিকভাবে হয়। মেয়েদের বাল্যবিয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে, যেন তাদের প্রজনন অঙ্গগুলো সঠিকভাবে বিকশিত হয় এবং পরবর্তীতে সুস্থ শরীরে সন্তান ধারণ ও জন্ম দিতে পারে, মাতৃমৃত্যুর হার কমে। একজন নারী যখন গর্ভবতী হবে তাকে যথাযথ চিকিৎসা সেবা দিতে হবে, পাশাপাশি পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে হবে যেন তার গর্ভের শিশু প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান লাভ করে এবং সঠিকভাবে বিকশিত হতে পারে। এভাবেই জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে পুষ্টিকর খাবার, সঠিক সেবা ও যত্ন নিশ্চিতের মাধ্যমে অপুষ্টির চক্র ভেঙে বেরিয়ে আসা সম্ভব।

সাব-টপিক ৩ : অপুষ্টি ও পুষ্টি চক্র

অপুষ্টি চক্র

পুষ্টি চক্র

সাব-টপিক ১ : শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন এবং কারণ

শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন (ছেলে ও মেয়ে) এবং কারণ

কৈশোরকাল : বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে যাদের বয়স ১০-১৯ বছরের মধ্যে তারাই কিশোর-কিশোরী। এই বয়সে তাদের নানারকম শারীরিক ও মনোসামাজিক পরিবর্তন ঘটে।

বয়ঃসন্ধি : বয়ঃসন্ধি হচ্ছে কিশোর-কিশোরীদের সাবালক হওয়ার প্রক্রিয়া। এই সময়ে তাদের শারীরিক পরিবর্তনগুলো প্রকাশ পায় এবং তারা প্রজনন ক্ষমতা অর্জন করে।

কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন

কিশোরদের শারীরিক পরিবর্তন

- উচ্চতা ও ওজন বাড়ে
- বুক ও কাঁধ চওড়া হয়
- হালকা গোঁফের রেখা দেখা দেয়
- গলার স্বর ভেঙে যায় এবং ভারী হয়
- অণ্ডকোষ এবং লিঙ্গের আকার বৃদ্ধি পায়
- লিঙ্গের চারপাশে ও বগলে লোম গজায়
- কখনো কখনো ঘুমের মধ্যে বীর্যপাত হয়
- চামড়া তৈলাক্ত হয়

কিশোরীদের শারীরিক পরিবর্তন

- উচ্চতা ও ওজন বাড়ে
- স্তনের আকার বড় হয়
- মাসিক শুরু হয়
- গলার স্বর পরিবর্তন এবং চিকন হয়
- উরু ও নিতম্ব ভারী হয়
- যোনি-অঞ্চল ও বগলে লোম গজায়
- জরায়ু ও ডিম্বাশয় বড় হয়
- চামড়া তৈলাক্ত হয়

কিশোর-কিশোরীদের মানসিক পরিবর্তন

- মনে নানা প্রশ্ন ও কৌতূহল জাগে
- বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে
- লাজুক ভাব দেখা দেয় ও সংকোচ বোধ করে
- নিজের প্রতি অন্যের বেশি মনোযোগ আশা করে
- আবেগপ্রবণ হয় ও স্নেহ-ভালোবাসা পেতে চায়
- বন্ধুবান্ধবের সঙ্গ এবং তাদের প্রতি নির্ভরতা বাড়ে
- স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে চায়
- বড়দের মতো আচরণ করতে চায়
- ভাবুক ও কল্পনাপ্রবণ হয়
- এ সময়ে কিশোর-কিশোরীদের মনে নানা প্রশ্ন, দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দেয় ও মনে চাঞ্চল্যভাব জন্মায়

কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের কারণ

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন মূলতঃ পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে হরমোন নিঃসরণের কারণে হয়ে থাকে। মস্তিষ্কের হরমোনগুলো বয়ঃসন্ধির সূচনা করে। হরমোন হচ্ছে শরীরের ভেতরে তৈরি এক ধরনের গ্রন্থিরস, যা দেহকে সক্রিয় রাখে এবং দেহের বৃদ্ধি ও উন্নয়নে সহায়তা করে। পুরুষের মধ্যে হরমোন টেস্টোস্টেরন অণ্ডকোষে শুক্রাণু তৈরি করে এবং বীর্য আকারে বের হয়ে আসে। নারীদের ক্ষেত্রে হরমোন ইস্ট্রোজেন ডিম্বাশয়ের বৃদ্ধি ও ডিম্ব তৈরি করে, যা ২১ থেকে ২৮ দিনের মধ্যে পরিপক্ব হয়ে মাসিক আকারে বের হয়ে আসে। এই হরমোনগুলোর প্রভাবে কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন প্রকাশ পায় এবং তারা প্রজনন ক্ষমতা অর্জন করে প্রাপ্ত বয়স বা পরিণত বয়সে পৌঁছায়। শরীর বেড়ে ওঠার এই ব্যাপারটা অনেকটাই নির্ভর করে শরীরের গঠনের ওপর, তবে এখানে সঠিক পুষ্টিরও যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

মনে রাখতে হবে : কৈশোরকালীন এইসব পরিবর্তন খুবই স্বাভাবিক। এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে লজ্জা, সংকোচ, ভয় বা দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।

সাব-টপিক ১ : শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন এবং কারণ

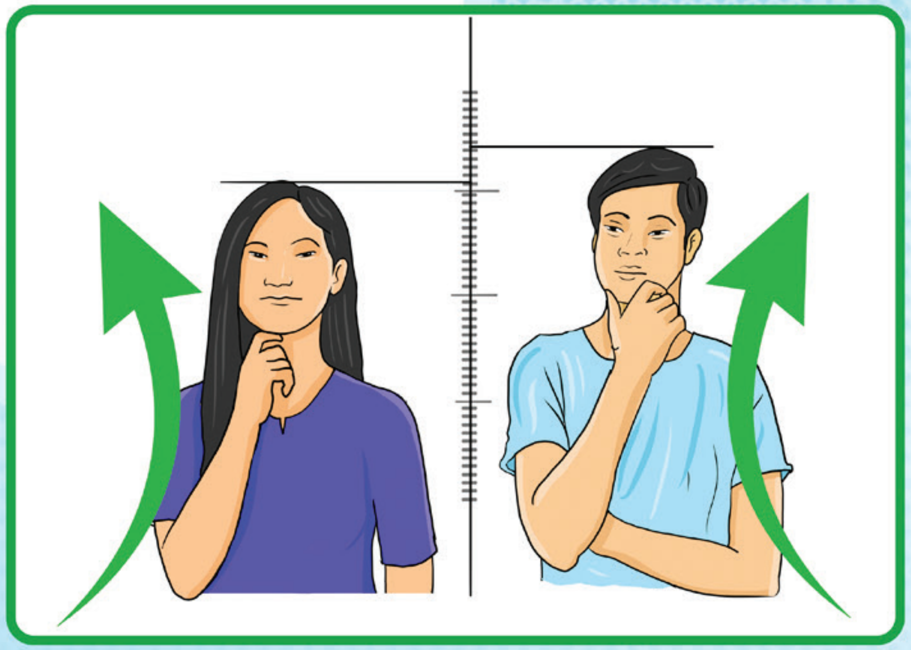

উচ্চতা ও ওজন বাড়ে

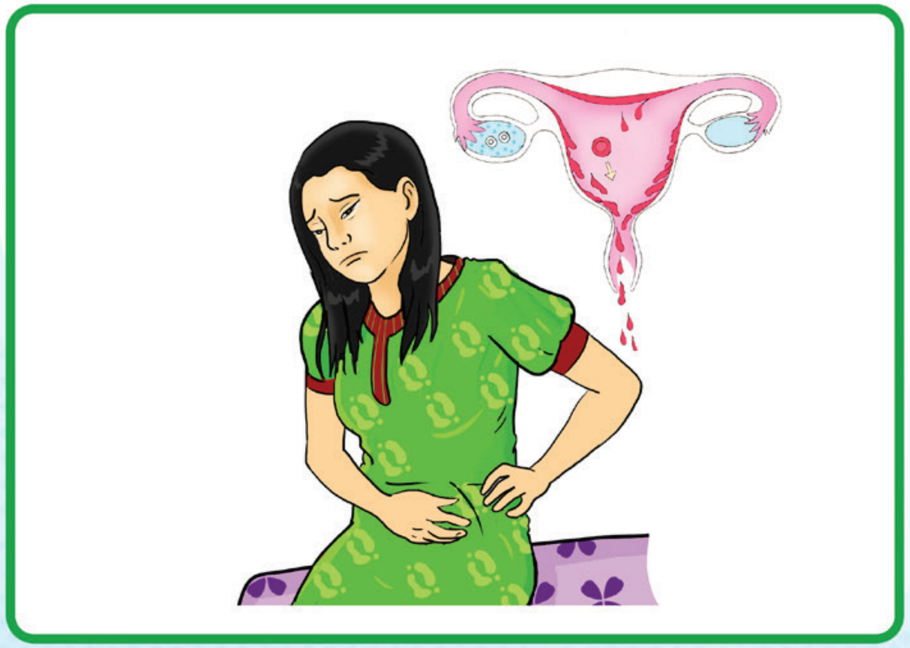

মাসিক শুরু হয়

হালকা গোঁফের রেখা দেখা দেয়

সাব-টপিক ২ : কৈশোরকালে কোন কোন খাবার শরীরে কোন কোন ধরনের উপকার করে

কৈশোরকালে কোন কোন খাবার শরীরে কোন কোন ধরনের উপকার করে

কৈশোরকাল হচ্ছে শারীরিক ও মানসিক বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে ১০-১৯ বছর পর্যন্ত বয়সকে কৈশোরকাল বলা হয়। এই সময়ে বাড়ন্ত শরীরের জন্য অতিরিক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন হয়। মানসিক বিকাশের জন্যও এই সময় পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন।

এই বয়সে স্বাস্থ্যসম্মত পুষ্টিকর খাদ্যের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ :

- কৈশোরে খুব দ্রুত শারীরিক বৃদ্ধি ঘটে। এই বৃদ্ধিকে স্বাভাবিকভাবে তরান্বিত করার জন্য একটু বেশি পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন।
- কিশোর-কিশোরীদের মানসিক পরিপক্বতা এই বয়সে শুরু হয়। এই সময়ে চাহিদা অনুযায়ী সঠিক পরিমাণে পুষ্টি উপাদানসমৃদ্ধ খাদ্য, যেমন : আমিষ, আয়োডিন, আয়রন, ফলিক অ্যাসিড, জিংক গ্রহণ করলে মানসিক বিকাশ সঠিকভাবে হবে।
- কৈশোর-পরবর্তী বছরগুলোতে কাজ করার ক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা যেন স্বাভাবিক থাকে, সেজন্য এই সময়ে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানসমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ।
- মেয়েদের ঋতুস্রাব বা মাসিকের জন্য শরীর থেকে রক্ত বের হয়ে যায়। এই ঘাটতি পূরণের জন্য পুষ্টিকর খাবার, বিশেষ করে আয়রনসমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করা খুবই জরুরি।
- গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন ঝুঁকি ও কম ওজনের শিশু জন্মদানের আশঙ্কা কমাতে কিশোরীদের পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা গুরুত্বপূর্ণ।
- ভিটামিন ও মিনারেল-সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণে প্রজনন ক্ষমতা স্বাভাবিক হয়।

সাব-টপিক ২ : কৈশোরকালে কোন কোন খাবার কোন কোন ধরনের উপকার করে

সাব-টপিক ১ : মাসিকের সংজ্ঞা ও এ সময়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য করণীয়

মাসিক বা ঋতুস্রাব সম্পর্কে ধারণা

ঋতুস্রাব বা মাসিক মেয়েদের দেহের স্বাভাবিক বিকাশের লক্ষণ। কৈশোরে, অর্থাৎ ১০-১৪ বছর বয়স থেকে মেয়েদের প্রতি মাসে জরায়ু থেকে যোনিপথ দিয়ে যে রক্তস্রাব হয়, তাকে ঋতুস্রাব বলে। প্রতি মাসে হয় বলে একে মাসিকও বলা হয়। কিশোরীদের পুষ্টির ঘাটতি হলে মাসিক দেরিতেও হতে পারে। মাসিক হলে বুঝতে হবে কিশোরীটি প্রজননক্ষম হয়েছে অর্থাৎ, তার শরীর এখন গর্ভধারণ করার উপযোগী। ৪৫-৫৫ বছর বয়সে স্বাভাবিক নিয়মেই মাসিক বন্ধ হয়ে থাকে, যাকে মেনোপজ বলে।

মাসিক বা ঋতুস্রাব সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য :

- এটি একটি স্বাভাবিক দৈহিক প্রক্রিয়া।
- সাধারণত ১০-১৪ বছর বয়সে শুরু হয় বা তার ব্যতিক্রমও হতে পারে।
- ঋতুস্রাব বা মাসিক সাধারণত ২৮ দিন পর পর হয়, তবে ২১ দিন থেকে ৩৫ দিনের মধ্যে হওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়। একে মাসিক চক্র বলে।
- স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি মাসেই ঋতুস্রাব বা মাসিক হয়ে থাকে এবং তা ৩ থেকে ৭ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়।
- ঋতুস্রাবের সময় সাধারণত মাথাব্যথা, কোমরে ব্যথা, তলপেটে ব্যথা ইত্যাদি হতে পারে, যা স্বাভাবিক।
- ঋতুস্রাব চলাকালীন সময় মেয়েরা অন্য সময়ের মতো স্বাভাবিক সব কাজ করতে পারবে।
- এই সময় সুষম খাবার, বিশেষ করে আয়রন/লৌহ ও প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে।

মাসিকের সময়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য করণীয়

১. এই সময়ে পরিষ্কার জীবাণুমুক্ত স্যানিটারি ন্যাপকিন বা প্যাড ব্যবহার করতে হবে। প্যাড স্রাবে ভিজে গেলে বদলাতে হবে, ৪-৬ ঘণ্টা পর পর অবশ্যই প্যাড পরিবর্তন করতে হবে। দিনে কমপক্ষে ৩ থেকে ৪ বার বদলানোর প্রয়োজন হয়।
২. ন্যাপকিন সহজলভ্য না হলে কিংবা পাওয়া না গেলে পরিষ্কার তুলা বা কাপড় ব্যবহার করতে হবে। এই সময়ে কাপড় ব্যবহার করলে ব্যবহৃত কাপড় আবার ব্যবহারের জন্য ভালো করে সাবান বা ডিটারজেন্ট পাউডার দিয়ে পরিষ্কার করে রোদে শুকিয়ে কাগজে মুড়িয়ে পরিষ্কার জায়গায় রাখতে হবে। কেননা, ঘরের কোণে বা অস্বাস্থ্যকর জায়গায় কাপড় রাখলে বিভিন্ন রোগ জীবাণুসহ পোকা-মাকড় বাসা বাঁধতে পারে। এর ফলে বিভিন্ন রোগ হতে পারে।
৩. স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারের পর তা কাগজের ব্যাগে মুড়িয়ে ডাস্টবিনে ফেলতে হবে অথবা মাটিতে পুতে ফেলতে হবে।
৪. ঋতুস্রাবের সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রতিদিন গোসল ও পরিষ্কার পোশাক পরতে হবে।
৫. প্রতিবার বাথরুম ব্যবহারের পর ভালো করে সাবান ও পরিষ্কার পানি দিয়ে হাত ধুতে হবে।
৬. ঋতুস্রাবের সময় মেয়েদের শরীর থেকে অনেক রক্ত বের হয়ে যায়। তাই, এই সময়ে একটু বাড়তি পুষ্টিকর খাবার খাওয়া দরকার। যেমন : ডিম, দুধ, মাছ, মাংস, ছোট মাছ, সব ধরনের ডাল, সবজি ও ফলমূল অর্থাৎ বৈচিত্র্যপূর্ণ সুষম খাদ্য গ্রহণ করতে হবে।
৭. ঋতুস্রাবের সময় অন্যান্য দিনের মতো স্বাভাবিক কাজকর্ম ও চলাফেরা করা যাবে। যেমন : স্কুলে যাওয়া, বাড়ির বাইরে যাওয়া, ঘরের কাজ করা, হালকা খেলাধুলা ও ব্যায়াম করা ইত্যাদি। তবে কাজের ফাঁকে বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন। এই সময় ভারী জিনিস বহন করা উচিত না।
৮. অনেক সময় কোমর ও তলপেটে বেশি ব্যথা হলে গরম সেঁক নেওয়া যেতে পারে।
৯. মাসিক দীর্ঘদিন বন্ধ থাকলে, ব্যথা তীব্র হলে, ঋতুস্রাব স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি হলে, সাত দিনের বেশি থাকলে, মাসে একাধিক বার হলে অথবা, দুর্গন্ধযুক্ত কালো কালো জমাট রক্ত গেলে সেটা স্বাভাবিক নয়। এরকম পরিস্থিতিতে নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র অথবা ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।
১০. যদি নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে কোনো কিশোরীর ঋতুস্রাব না হয়, তাহলে তাকে জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

সাব-টপিক ১ : মাসিকের সংজ্ঞা ও এ সময়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য করণীয়

পরিষ্কার জীবাণুমুক্ত স্যানিটারি ন্যাপকিন বা প্যাড ব্যবহার করতে হবে

কাপড় ব্যবহার করলে ব্যবহৃত কাপড় ভালো করে সাবান বা ডিটারজেন্ট পাউডার দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে

ঋতুস্রাবের সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ

মাসিক চলাকালীন সবসময় প্যাড সাথে রাখতে হবে

স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারের পর তা কাগজের ব্যাগে মুড়িয়ে ডাস্টবিনে ফেলতে হবে

সাব-টপিক ২ : মাসিককালীন পুষ্টিকর খাবার এবং প্রচলিত ভুল ধারণা

মাসিককালীন পুষ্টিকর খাবার

মাসিকের সময় যে সকল পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে

মাসিক চলাকালীন কিশোরীর খাদ্য : মাসিকের সময় দেহ থেকে রক্তক্ষরণ হয়, ফলে পুষ্টিহীনতা ও রক্তস্বল্পতা দেখা দিতে পারে। এই ঘাটতি পূরণের জন্য স্বাভাবিক খাবারের পাশাপাশি আয়রন, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আঁশযুক্ত ও ভিটামিনসমৃদ্ধ খাবার খাওয়া দরকার। এসব খাবার মাসিক চলাকালীন সময় মেয়েকে সুস্থ ও সবল রাখতে সাহায্য করে।

আয়রনযুক্ত খাবার মাসিকের সময় আয়রনের ঘাটতি দূর করে	মাছ, মাংস, কলিজা, ডিম, ঘন সবুজ পাতা জাতীয় শাকসবজি, দানা জাতীয় শস্য, মটরশুঁটি, শিম, বরবটি, বাদাম, সয়াবিন, গুড় ও শুকনা ফলে যথেষ্ট পরিমাণে আয়রন থাকে।
ক্যালসিয়াম যুক্ত খাবার রক্তজমাট বাঁধায় সাহায্য করে	দুধ ক্যালসিয়ামের উৎকৃষ্ট উৎস। দুগ্ধজাতীয় খাদ্য, যেমন : দই, ছানা, পনির, মাওয়া, কাঁটাসহ ছোট মাছে প্রচুর ক্যালসিয়াম আছে। সবুজ শাকসবজি, লবণ, কলমিশাক, ডাঁটাশাক, পুঁইশাক, শজনে পাতা, লালশাক ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে। সবজির মধ্যে ঢেঁড়স, ধুন্দুল, বাঁধাকপি, ফুলকপি, শিম, ইত্যাদি সবজি, ছোলা, মাসকলাই, মুগ ও সয়াবিনে ক্যালসিয়াম থাকে।
ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার মাথাব্যথা ও পায়ের মাংসপেশির যন্ত্রণা কমাতে সাহায্য করে	প্রায় সবধরনের মাছেই উচ্চমাত্রায় ম্যাগনেসিয়াম আছে। গমের রুটি, সাদা ভাত, সবুজ পাতাযুক্ত শাকসবজি, পালংশাক, শিম, শিমের বিচি, বরবটি, মটরশুঁটি, কলা, কুমড়া, লেটুসপাতা ম্যাগনেসিয়ামের অন্যতম প্রধান উৎস। কাজুবাদাম, চীনাবাদাম-এগুলো ম্যাগনেসিয়ামের উৎকৃষ্ট উৎস।
আঁশযুক্ত খাবার হজম বা পরিপাকে খুবই সহায়ক	ডাঁটাশাক, মটরশুঁটি, শিম, বরবটি, মিষ্টি আলু, গমের রুটি, ঢেঁকিছাটা চাল, বাদাম, আপেল, কালো আঙুর, খেজুর ইত্যাদি।
ভিটামিনসমৃদ্ধ খাবার অনিয়মিত মাসিক ও মাসিকের সময়ে মাথাব্যথা হ্রাসে সাহায্য করে	ভিটামিন 'বি'-১ সমৃদ্ধ খাবার : দুধ, ডিম, সামুদ্রিক মাছ, কডলিভার, কলিজা, মুরগি, ছোলা, পালংশাক, মটরশুঁটি, পাকা কলা ইত্যাদি। ভিটামিন 'ডি' সমৃদ্ধ খাবার: ভেটকি বা কোরাল মাছ, তেলাপিয়া, মাগুর ও শুঁটকি মাছে ভিটামিন 'ডি' আছে। ভিটামিন 'ডি'র অপর একটি চমৎকার উৎস হচ্ছে দুধ। গরু, খাসির মাংসের কলিজায় ভিটামিন 'ডি' আছে। ডিমে অতিরিক্ত পরিমাণে ভিটামিন 'ডি' আছে। যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে, তাদের ডিমের কুসুম খাওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। শস্যদানায় ও মাশরুমে ভিটামিন 'ডি' আছে। রোদ ভিটামিন 'ডি'র অন্যতম উৎস। সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত রোদ সবচেয়ে ভালো। সপ্তাহে ২ বার ১৫ থেকে ৩০ মিনিট রোদে বসায় রয়েছে অনেক উপকার।

আমাদের সমাজে ঋতুস্রাব সম্পর্কিত কিছু ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। যেমন :

- ঋতুস্রাব চলাকালে মেয়েরা দূষিত ও অপবিত্র হয়ে যায়, তাই এই সময় তাদের আলাদা ঘরে থাকার ব্যবস্থা করা হয়।
- এই সময়ে বাড়ি বা ঘরের বাইরে গেলে খারাপ জিন-ভূত আছর করে।
- এই সময়ে টক খাওয়া যাবে না, খেলে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হবে।
- এই সময়ে মাছ-মাংস খাওয়া যাবে না, খেলে শরীরে আঁশটে গন্ধ হবে।
- স্বামী বা শ্বশুর-শ্বাশুড়িকে খাবার তুলে দেওয়া যাবে না।
- এই সময়ে মৃত ব্যক্তির কাছে যাওয়া যাবে না।
- এই সময়ে গরুর ঘরে যাওয়া যাবে না।
- চুল ছেড়ে বসা বা চলাফেরা করা যাবে না।
- ঋতুস্রাব ছোঁয়াচে রোগ, একজনের হলে আরেকজনের হয়।

উপরে উল্লিখিত ভ্রান্ত ধারণাগুলো বিজ্ঞানসম্মত নয়। জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, এলাকাভিত্তিক আরও ভ্রান্ত ধারণা আছে, যেগুলো আমরা অনেকেই জানি না। বর্তমান ডিজিটাল যুগে এই সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে আমাদের পিছিয়ে থাকলে চলবে না। যথাযথ কাউন্সেলিং, প্রচার এবং প্রসারের মাধ্যমে ভ্রান্ত ধারণাগুলো সমাজ থেকে দূর করে সুস্থ এবং সাবলীল জাতি গঠন করতে হবে।

সাব-টপিক ২ : মাসিককালীন পুষ্টিকর খাবার এবং প্রচলিত ভুল ধারণা

আয়রনযুক্ত খাবার

ক্যালসিয়ামযুক্ত খাবার

ম্যাগনেসিয়ামযুক্ত খাবার

আঁশযুক্ত খাবার

ভিটামিন বি-১ সমৃদ্ধ খাবার

ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার

ভিটামিন ও আয়রন ফলিক অ্যাসিড

সাব-টপিক ১ : স্বপ্নদোষ ও ব্যক্তিগত ও যৌনাঙ্গের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও যত্নে করণীয়

স্বপ্নদোষ বা বীর্যপাত

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোরদের শারীরিক পরিবর্তনের সাথে সাথে মানসিক পরিবর্তনও ঘটে, যার ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই অনেক বিষয়ে বিশেষ করে যৌনতাবিষয়ক কৌতূহল দেখা দেয়। বয়ঃসন্ধিকালে হরমোনের প্রভাবে শরীরের অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত বীর্য তৈরি হয় এবং বীর্যথলিতে তা জমা হতে থাকে। বীর্যথলি যখন বীর্যে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তখন বীর্য স্বাভাবিক নিয়মে যৌনাঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে আসে। একেই বলে বীর্যপাত। ঘুমের মধ্যে এই বীর্য বেরিয়ে আসাকে প্রচলিত ভাষায় বলা হয় স্বপ্নদোষ। একটি ছেলে যে বড় হচ্ছে বীর্যপাত বা স্বপ্নদোষ তারই লক্ষণ। যদিও স্বপ্নদোষ না হওয়াও কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এর অর্থ এই নয় যে তার দেহে ঠিকমতো বীর্য তৈরি হচ্ছে না।

স্বপ্নদোষ/বীর্যপাত সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- এটি কোনো অসুখ নয় বরং বয়ঃসন্ধিকালে স্বপ্নদোষ একটি স্বাভাবিক ব্যাপার।
- সাধারণত ১২-১৩ বছর বয়স থেকে বীর্য তৈরি হতে শুরু করে এবং এটি সারা জীবন চলতে থাকে।
- স্বপ্নদোষের মাধ্যমে শরীরের কোনো শক্তির অপচয় হয় না এবং শরীর দুর্বলও হয় না।
- স্বপ্নদোষের ফলে বীর্যপাত হলে লজ্জা বা অপরাধবোধে ভোগার কোনো কারণ নেই।
- স্বপ্নদোষ হলে বড়দের সাথে আলোচনা করে বিষয়টি জেনে নিতে হবে। কোনো সমস্যা হলে স্বাস্থ্যকর্মী বা চিকিৎসকের সাহায্য নিতে হবে। তবে কোনো অবস্থাতেই হাতুড়ে চিকিৎসকের কাছে যাওয়া যাবে না।

স্বপ্নদোষ/বীর্যপাত হলে ব্যক্তিগত ও যৌনাঙ্গের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও যত্নে করণীয়

- ❑ দাঁত, চুল পরিষ্কার রাখা
- ❑ নিয়মিত নখ কাটা ও পরিষ্কার রাখা
- ❑ যৌনাঙ্গ পরিষ্কার রাখা
- ❑ বগল এবং যৌনাঙ্গের চুল কাটা
- ❑ পরিষ্কার অন্তর্বাস ও পোশাক পরা
- ❑ নিয়মিত সাবান দিয়ে গোসল করা
- ❑ ঘুমের মধ্যে স্বপ্নদোষ হলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে পরিষ্কার কাপড় পরিধান করা এবং স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করা

সাব-টপিক ১ : স্বপ্নদোষ ও ব্যক্তিগত ও যৌনাঙ্গের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও যত্নে করণীয়

সেশন ৭ : গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়ের পুষ্টি এবং যত্ন

সাব-টপিক ১ : গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়ের যত্ন এবং পুষ্টি

গর্ভবতী মায়ের যত্ন

- কমপক্ষে ৪ বার নিকটস্থ ক্লিনিকে গিয়ে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করতে হবে।
- ১০ ধরনের খাদ্য থেকে কমপক্ষে ৫ ধরনের খাবার প্রতিদিন গ্রহণ করতে হবে (পরবর্তী পাতায় বিস্তারিত দেখুন)।
- খাবারের সাথে সাথে বা কিছুক্ষণের মধ্যে ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ খাবার খেলে আয়রনের শোষণ বৃদ্ধি পায়, তাই এই জাতীয় খাবার খেতে হবে।
- গর্ভবতী মহিলাদের দৈনিক ৩ বেলা খাবারের পাশাপাশি ১ বেলা অতিরিক্ত খাবার গ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে।
- খাবার রান্নার সময় আয়োডিনযুক্ত লবণ দিতে হবে এবং সামুদ্রিক মাছ খেতে হবে।
- গর্ভবতী মা গর্ভ নিশ্চিত হওয়ার পর প্রতি রাতে খাওয়ার পর ১টি করে আয়রন ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট গ্রহণ করতে হবে (সন্তান জন্মদানের ৩ মাস পর্যন্ত সেবন করতে হবে)।
- গর্ভধারণের ৪ মাস থেকে সন্তান জন্মদানের পর ৩ মাস পর্যন্ত ২টি করে ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট (৫০০ মি.গ্রা.) প্রতিদিন সকালে ও দুপুরে খাবারের পর গ্রহণ করতে হবে।
- গর্ভাবস্থায় এবং প্রসবোত্তর সময়ে একজন নারীকে অবশ্যই দিনে ২ ঘণ্টা বিশ্রাম এবং রাতে কমপক্ষে ৮ ঘন্টা ঘুম/বিশ্রাম নিশ্চিত করতে হবে।
- ভারী কাজকর্ম করা থেকে বিরত থাকতে হবে। স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে হবে।

গর্ভবতী মায়ের পুষ্টি

গর্ভধারণ ও সন্তান পালন সকল স্তন্যপায়ী প্রাণীর একটি স্বাভাবিক কাজ। সন্তান যখন মায়ের দেহ থেকে পুষ্টি উপাদান নিয়ে ক্রমে নিজের দেহ গঠন করে তখন গর্ভবতী মায়ের অতিরিক্ত পুষ্টি চাহিদার প্রয়োজন হয়।

মায়ের খাদ্যে যদি তার নিজের ও গর্ভস্থ সন্তানের চাহিদা পূরণের উপযুক্ত পুষ্টি উপাদান না থাকে, তবে মায়ের শরীর ক্ষয় হয়ে শিশুর প্রয়োজন মেটানোর প্রক্রিয়া চলে। এই অবস্থায় মা ও শিশু দুইজনেই পুষ্টিহীনতার শিকার হয়। যদি মায়ের নিজের দেহের গঠন সম্পূর্ণ না হয়, তখন গর্ভবতী হলে নিজের দেহ গঠনের চাহিদা ও সন্তানের দেহ গঠনের চাহিদা - এই দুই অতিরিক্ত চাহিদার কারণে মায়ের শারীরিক ও মানসিক জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। এই সময়ে মায়ের পুষ্টি উপাদানের অভাব তীব্র হলে শিশু মায়ের শরীর থেকে যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টি উপাদান পায় না। ফলে অপরিণত, বিকলাঙ্গ এমনকি মৃত শিশুও ভূমিষ্ঠ হতে পারে। সুতরাং, গর্ভধারণ ও স্তন্যদানকাল - এই দুই সময়ই মায়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য নানা উৎস থেকে বৈচিত্র্যপূর্ণ খাদ্যগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সাধারণত প্রতিদিন ১০ ধরনের খাদ্য থেকে অন্তত ৫ ধরনের খাদ্য গ্রহণ করলে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানগুলো পাওয়া যেতে পারে।

দুগ্ধদানকারী মায়ের যত্ন

- দুগ্ধদানকারী মাকে দিনে ৩ বেলা খাবারের পাশাপাশি ২ বেলা অতিরিক্ত খাবার গ্রহাণের জন্য উৎসাহিত করতে হবে।
- খাবারে আয়োডিন যুক্ত লবণ গ্রহণ করতে হবে।
- শিশুর জন্মের ৪২ দিনের মধ্যে মা-কে ভিটামিন 'এ' দিতে হবে।
- ১০ ধরণের খাবার থেকে কমপক্ষে ৫ ধরণের খাবার প্রতিদিন গ্রহণ করতে বলা বা উৎসাহিত করতে হবে।
- খাবারের সাথে সাথে বা কিছুক্ষণের মধ্যে ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে।
- প্রসবপরবর্তী পিএনসি গ্রহণের জন্য মায়ের সাথে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়া কমপক্ষে ৪বার PNC নিতে হবে।
- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট ও ক্যালসিয়াম বড়ি খাওয়া নিশ্চিত করতে হবে।
- মাকে অবশ্যই দিনের বেলা ২ ঘন্টা বিশ্রাম ও রাতে কমপক্ষে ৮ ঘন্টা ঘুমানোর পরামর্শ দিতে হবে।
- মা-কে মানসিক প্রশান্তিতে রাখতে হবে। অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক চাপ বুকের দুধ উৎপাদন ও নিঃসরনে ব্যঘাত ঘটায়।

দুগ্ধদানকারী মায়ের পুষ্টি ও যত্ন

সন্তান জন্মদানের সময় বা প্রসবের সময় মায়ের শরীরের ওপর অনেক চাপ পড়ে এবং তার দেহের অনেক ক্ষয় হয়। দেহের এ ক্ষয়পূরণ, পুষ্টিসাধন এবং দেহকে সুস্থ-সবল ও নিরোগ রাখার জন্য গর্ভবতী মায়ের মতো দুগ্ধদানকারী মাকেও বেশি করে পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। মায়ের নিজের দেহের ক্ষয়পূরণ ও বুকের দুধ উৎপাদনের জন্য প্রোটিন বা আমিষের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। এ জন্য মাকে প্রতিদিন আমিষজাতীয় খাবার যথা - মাছ-মাংস, ডিম, দুধ, ডাল ইত্যাদি বেশি করে খেতে হবে।

প্রাণীজ আমিষ মায়ের দুধের উৎকৃষ্ট উপাদান, যা শিশুর শরীর বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন। ক্যালসিয়াম ও লৌহজাতীয় খাবারও মাকে বেশি করে খেতে হবে, যাতে দুধের মধ্যে এ দুটি উপাদান শিশুর দেহের চাহিদা পূরণ করতে পারে। এ কারণে স্তন্যদানকালে মায়ের প্রথম ছয়মাস অতিরিক্ত ক্যালরি প্রয়োজন হয়। এ ক্যালরি দুধ তৈরি ও নিঃসৃত করার কাজে ব্যয় হয়, তাই অতিরিক্ত ক্যালরিসমৃদ্ধ খাদ্য ভাত, রুটি, মিষ্টি জাতীয় খাদ্য ইত্যাদি খাওয়া উচিত। এছাড়াও ভিটামিন ও মিনারেল অতিরিক্ত চাহিদা পূরণের জন্য মাকে তাজা শাক-সবজি ও মৌসুমী ফলমূল খেতে হবে।

প্রসুতি মা যখন শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ান, তখন তার শরীর থেকে প্রতিদিন অনেক পানি বের হয়ে যায়। এ ঘাটতি পূরণের জন্য মাকে প্রচুর পানি পান করতে হবে। তাহলে দুধের প্রবাহ সহজ হয়। এছাড়া রসালো ফলমূল এবং বেশি করে ঝোল দিয়ে রান্না করা মাছ-মাংস তরকারি ও বেশ উপকারী। এছাড়াও খাবার এবং অভ্যাসের সংমিশ্রণে প্রাকৃতিকভাবে বুকের দুধ সরবরাহ বাড়ানো সম্ভব।

সাব-টপিক ১ : গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়ের যত্ন এবং পুষ্টি

১০ ধরনের খাদ্য থেকে কমপক্ষে ৫ ধরনের খাবার প্রতিদিন গ্রহণ করতে হবে

গর্ভকালীন সময়ে ও প্রসবের পরে ৪ বার নিকটস্থ ক্লিনিকে গিয়ে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করতে হবে

পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে

আয়রন ফলিক অ্যাসিড গ্রহণ করতে হবে

পুষ্টি নিশ্চিত করতে শিশুকে বুকের দুধ পান করাতে হবে

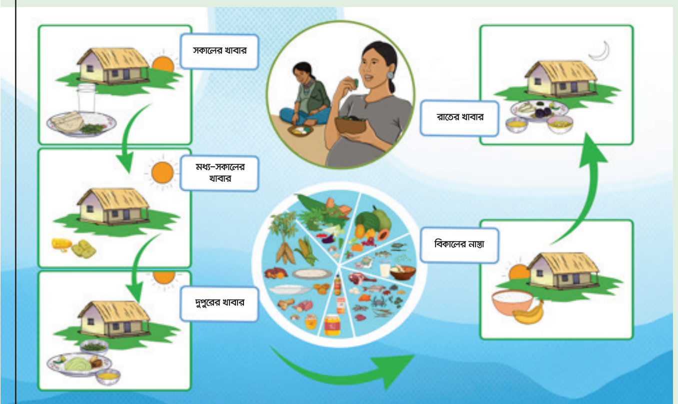

সাব-টপিক ২ : গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়ের খাবার তালিকা

গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়ের খাবার তালিকা

(স্থানীয় খাবারের প্রাপ্যতা অনুযায়ী তৈরি)

একজন গর্ভবতী মায়ের নমুনা খাদ্য তালিকা	একজন দুগ্ধদানকারী মায়ের নমুনা খাদ্য তালিকা
সকালের নাস্তা (৮ টায়) ভাত/রুটি, ডিম, মিশ্র সবজি	**সকালের নাস্তা (৮ টায়)** ভাত/রুটি, ডিম, মিশ্র সবজি
মধ্য সকাল (১১ টায়) যেকোনো মৌসুমি ফল, দুধের তৈরি খাবার	**মধ্য সকাল (১১ টায়)** যেকোনো মৌসুমি ফল, দুধের তৈরি খাবার
দুপুরের খাবার (২ টায়) ভাত/আলু, ঘন ডাল, মিশ্র সবজি, শাক, মাছ-মাংস, শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া, লেবু/সালাদ	**দুপুরের খাবার (২ টায়)** ভাত/আলু, মাঝারি ঘন ডাল, মিশ্র সবজি, শাক, মাছ-মাংস, শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া, লেবু/সালাদ
বিকালের নাস্তা (৫ টায়) বিস্কুট বা মুড়ি অথবা হাতের তৈরি যেকোনো নাস্তা, পাকা আম/কলা (অথবা এলাকায় যেসব ফল পাওয়া যায়)	**বিকালের নাস্তা (৫ টায়)** বিস্কুট বা মুড়ি, অথবা হাতের তৈরি, যেকোনো নাস্তা, পাকা আম/কলা (অথবা এলাকায় যেসব ফল পাওয়া যায়)
রাতের খাবার (৮ টায়) ভাত, মাছ/মাংস, মিশ্র সবজি, ঘন ডাল, শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া, লেবু	**রাতের খাবার (৮ টায়)** ভাত, মাছ/মাংস, মিশ্র সবজি, মাঝারি ঘন ডাল,শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া, লেবু

- কাঁচা পেঁপে, গাজর, আনারস খাওয়া থেকে বিরত থাকবেন।
- গর্ভাবস্থায় কৃমিনাশক ঔষধ, যেকোনো মাদকদ্রব্য সেবন করা থেকে বিরত থাকুন।

সাব-টপিক ২ : গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়ের খাবার তালিকা

সাব-টপিক ৩ : গর্ভকালীন ও প্রসব-পরবর্তী সেবা (এএনসি ও পিএনসি)

গর্ভকালীন ও প্রসব-পরবর্তী সেবা (এএনসি ও পিএনসি)

নিয়মিত গর্ভকালীন স্বাস্থ্য পরীক্ষা (এএনসি) করাতে হবে :

১ম স্বাস্থ্য পরীক্ষা	- ১৬ সপ্তাহে (৪ মাস)
২য় স্বাস্থ্য পরীক্ষা	- ২৪-২৮ সপ্তাহে (৬-৭ মাস)
৩য় স্বাস্থ্য পরীক্ষা	- ৩২ সপ্তাহে (৮ মাস)
৪র্থ স্বাস্থ্য পরীক্ষা	- ৩৬ সপ্তাহে (৯ মাস)

নিয়মিত প্রসব-পরবর্তী স্বাস্থ্য পরীক্ষা (পিএনসি) করাতে হবে :

শিশু জন্মের পর অন্তত ৪ বার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী দ্বারা প্রসব পরবর্তী স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে।

১ম স্বাস্থ্য পরীক্ষা	২৪ ঘণ্টার মধ্যে
২য় স্বাস্থ্য পরীক্ষা	প্রসবের ২-৩ দিনের মধ্যে
৩য় স্বাস্থ্য পরীক্ষা	প্রসবের ৭-১৪ দিনের মধ্যে
৪র্থ স্বাস্থ্য পরীক্ষা	প্রসবের ৪২-৪৫ দিনের মধ্যে

সাব-টপিক ৩ : গর্ভকালীন ও প্রসব-পরবর্তী সেবা (এএনসি ও পিএনসি)

সাব-টপিক ১ : শালদুধ ও মায়ের দুধের উপকারিতা

শালদুধ কী, জন্মের কতক্ষণের মধ্যে বুকের দুধ পান করাতে হবে

শাল দুধ হলো শিশু জন্মের পর পর মায়ের স্তন থেকে নিঃসৃত ঈষৎ হলুদাভ আঠালো দুধ, যা শিশুজন্মের ২ থেকে ৫ দিন পর্যন্ত থাকে। জন্মের সাথে সাথে (১ ঘণ্টার মধ্যে) শিশুকে শালদুধ পান করাতে হবে।

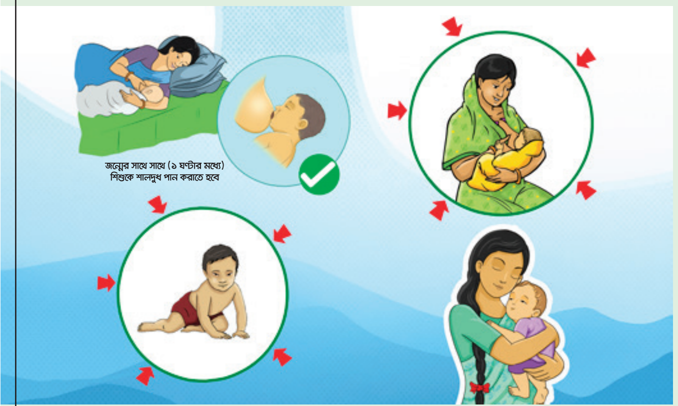

মায়ের দুধের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা

মায়ের দুধের উপকারিতা		
শিশুর জন্য	**মায়ের জন্য**	**পরিবারের জন্য**
• শালদুধ পরিমাণে অল্প ও ঘন হয় কিন্তু এতে পুষ্টিগুণ তুলনামূলক অনেক বেশি। এটি হলুদাভ রং, কারণ এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ' থাকে। • শাল দুধে অ্যান্টিবডি ও নবজাতকের রোগ প্রতিরোধক উপাদান থাকে, যা শিশুকে জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করে, তাই একে শিশুর জীবনের প্রথম টিকা বলা হয়। • শালদুধ সহজপাচ্য হওয়ায় শিশুর জন্য খুবই উপযোগী, এলার্জির ঝুঁকিও কমে যায়। • শালদুধ খাওয়ালে শিশু তাড়াতাড়ি পায়খানা করে, ফলে জন্ডিস হবার সম্ভাবনা কমে যায় • অপরিণত ও কম ওজন বিশিষ্ট শিশুর জন্য শালদুধ জীবনরক্ষাকারী। • ছয় মাস বয়স পর্যন্ত কেবল মায়ের দুধই শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সবধরনের পুষ্টি জোগায়। • শিশুর মারাত্মক রোগ (যেমন : নিউমোনিয়া, জন্ডিস, ডায়রিয়া) ও মৃত্যু ঝুঁকি প্রতিরোধ করে। • মা ও শিশুর আত্মিক বন্ধন দৃঢ় হয়।	• জন্মের সাথে সাথে (১ ঘণ্টার মধ্যে) শালদুধ দিলে মায়ের গর্ভফুল দ্রুত পড়ে যায়। • জন্মের পর পর শিশুকে দুধ খাওয়ালে প্রসবকালীন রক্তক্ষরণ কম হয়, ফলে মা রক্তস্বল্পতার হাত থেকে রক্ষা পায়। • জন্মের পর প্রথম ৬ মাস শুধু বুকের দুধ খাওয়ালে : – মায়ের গর্ভধারণের ঝুঁকি কমে – স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে	• পরিবারের অর্থ সাশ্রয় হয় • পরিবারের নতুন প্রজন্ম পূর্ণতার সাথে বেড়ে ওঠে

সাব-টপিক ১ : শালদুধ ও মায়ের দুধের উপকারিতা

জন্মের সাথে সাথে (১ ঘণ্টার মধ্যে)
শিশুকে শালদুধ পান করাতে হবে

মায়ের দুধ শিশুর মারাত্মক রোগ
ও মৃত্যুঝুঁকি প্রতিরোধ করে

শাল দুধকে শিশুর জীবনের
প্রথম টিকা বলা হয়।

শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ালে
মা ও শিশুর আত্মিক বন্ধন দৃঢ় হয়

সাব-টপিক ২ : নবজাতকের ৬টি বিপদচিহ্ন

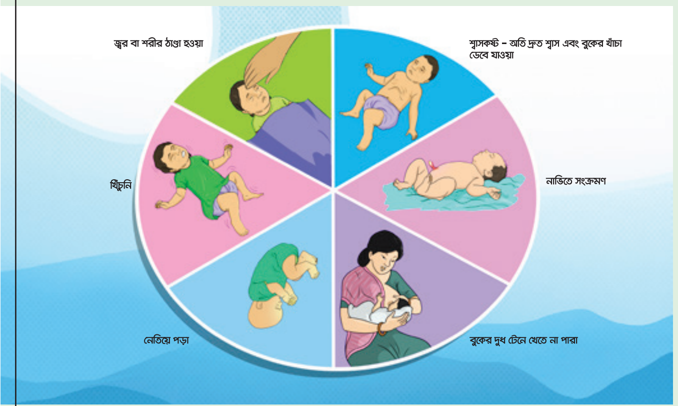

বিপদচিহ্ন ১ : শ্বাস কষ্ট অতি দ্রুত শ্বাস (৬০ মিনিট-এর বেশি সময় ধরে) এবং বুকের খাঁচা ডেবে যাওয়া

করণীয় : শিশুর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে বুঝতে পারা মাত্র তাকে অতিদ্রুত কাছের হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসায় ভালো না হলে সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ভর্তি রেখে অক্সিজেন, নেবুলাইজার দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

বিপদচিহ্ন ২ : নাভিতে সংক্রমণ

- নাভির চারপাশে লাল দাগ হওয়া
- নাভির চারপাশে ফোলা ভাব
- নাভিতে চুলকানি হওয়া
- নাভি থেকে হলুদ/সবুজ তরল বা পুঁজ নির্গত হওয়া
- জ্বর, অসুস্থ কিংবা ক্লান্তি বোধ করা

করণীয়: নাভিতে সংক্রমণের লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। নাভিতে কী ধরনের সংক্রমণ হয়েছে তা সনাক্ত করে তা থেকে প্রতিকারের উপায় চিকিৎসকই বলে দেবেন। নাভি ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক নাকি ইস্টের দ্বারা সংক্রমিত হয়েছে তার ওপর নির্ভর করে এর ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। নিজে থেকে অনুমান করে চিকিৎসা করা উচিত না।

বিপদচিহ্ন ৩ : বুকের দুধ টেনে খেতে না পারা

একটি শিশু যদি শুরুতে মায়ের দুধ টেনে খেতে পারলেও ৪র্থ, ৫ম অথবা, ১৫তম দিনে যদি আর মায়ের দুধ টেনে খেতে না পারে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

বিপদচিহ্ন ৪ : নেতিয়ে পড়া

করণীয় : শিশুকে দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতাল অথবা, চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

বিপদচিহ্ন ৫ : খিঁচুনি

নবজাতকের খিঁচুনি হলে জোরে জোরে হাত পা ঝাঁকানো ছাড়াও চোখ উল্টিয়ে চোখের কালো মনি ভিতরে ঢুকে গিয়ে চোখের সাদা অংশ বাহিরের দিকে চলে আসা, নবজাতক একদিকে বাঁকা ও শক্ত হয়ে দীর্ঘ সময় থাকা, চোখের মনি স্থির থাকা, শরীরের কোন অংশ একটানা অস্বাভাবিকভাবে নড়তে থাকা খিঁচুনির লক্ষণ।

করণীয় : আক্রান্ত শিশুকে তাৎক্ষণিক হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। খিঁচুনি অন্তর্বর্তীকালীন বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। হাসপাতালে নেয়ার সময় শিশুকে গরম রাখতে হবে, ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার খুবই উপযোগী। বিকল্প হিসেবে কয়েক লেয়ারের সুতির গরম কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে রাখতে হবে।

বিপদচিহ্ন ৬ : জ্বর বা শরীর ঠাণ্ডা হওয়া

জ্বরের তাপমাত্রা ১০০.৪ ফারেনহাইট বেশি বা কম তাপমাত্রা ৯৬.৮ ফারেনহাইটের কম

করণীয় : একটি শিশু জন্ম নেওয়ার ২৮ দিন পর্যন্ত নবজাতক বলা হয়। এ সময় শিশুর অতিরিক্ত বা স্বল্প জ্বর হতে পারে এ অবস্থাকে হাইপোথার্মিয়া বলা হয়। এটি শিশুর জন্য বিপদ, এ সময় দেখা যায় বুকটা হঠাৎ করেই ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, তখন দেরি না করে তাড়াতাড়ি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে বা নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে।

সাব-টপিক ২ : নবজাতকের ৬টি বিপদচিহ্ন

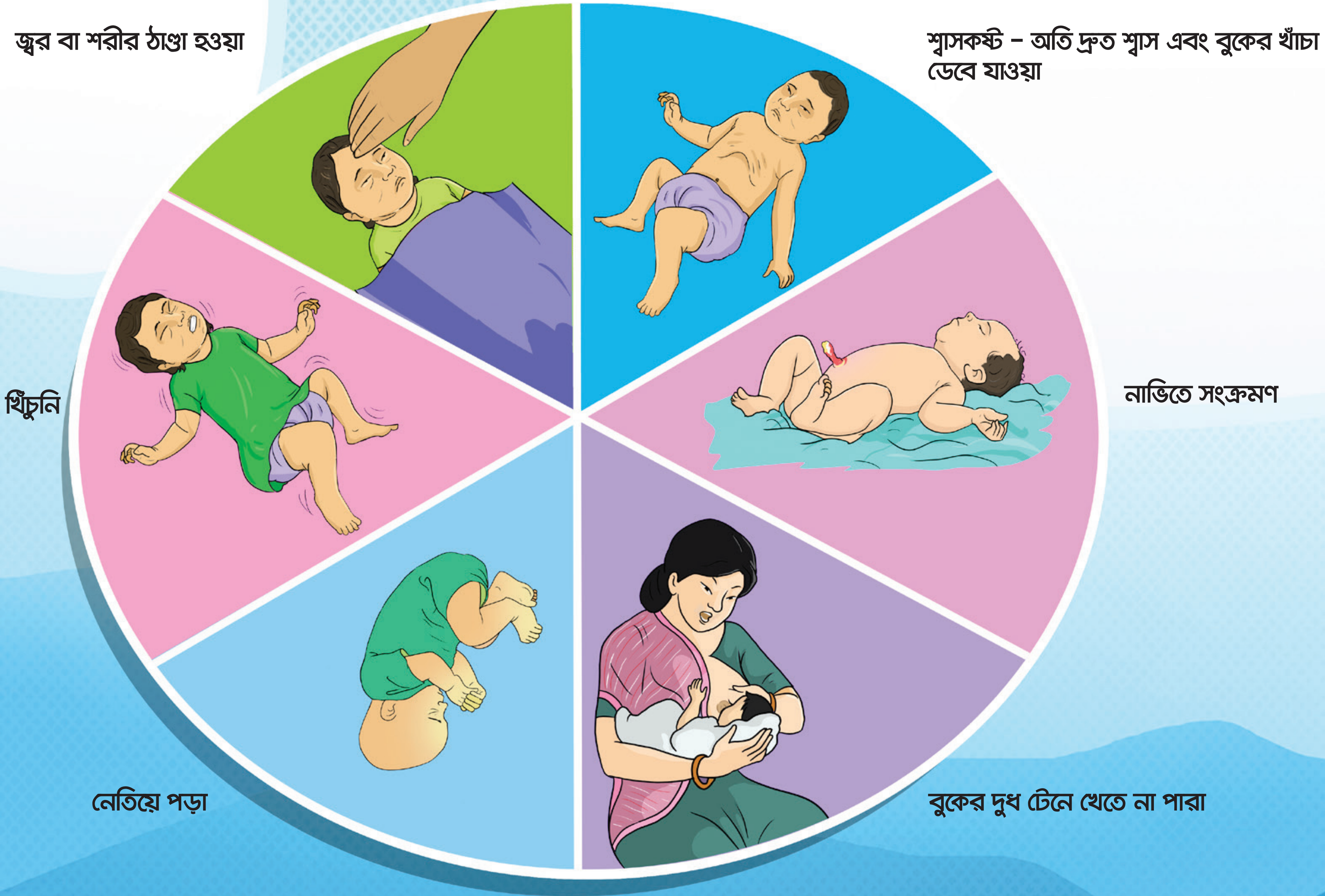

সেশন ৯ : এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং (শুধুই বুকের দুধ পান করানো) ও সঠিকভাবে বুকের দুধ খাওয়ানোর উপায়

সাব-টপিক ১ : এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং বা শুধুই বুকের দুধ পান করানো

WHO এবং UNICEF-এর সুপারিশ অনুযায়ী শিশুকে শুধুই বুকের দুধ পান করানো বলতে শিশুর জন্মের প্রথম ঘণ্টার মধ্যে বুকের দুধ খাওয়ানো থেকে শুরু করে তার জীবনের প্রথম ৬ মাস শুধুমাত্র বুকের দুধ খাওয়ানোকে বোঝায়। এ সময় শুধু মায়ের বুকের দুধই পারে শিশুকে সুস্থ ও নিরোগ রাখতে। তাই পানি বা অন্য কোনো তরল দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

কেন ৬ মাস পর্যন্ত শুধুই বুকের দুধ পান করাতে হবে?

- বুকের দুধে শ্বেতকণিকা, নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি এবং অন্যান্য অ্যান্টিমাইক্রোবায়োল উপাদান রয়েছে, যা বুকের দুধ খাওয়ানো শিশুদের সাধারণ সংক্রমণ, যেমন : ডায়রিয়া, আমাশয়, শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ, মূত্রনালীর সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে। ফর্মুলা বা অন্য কোনো দুধে এসব থাকে না।
- তৈরি করার ঝামেলা নেই। শিশুর চাহিদা অনুযায়ী দিনে ও রাতে শিশু যতবার চায় ততবার তাকে দেওয়া যায়। বোতলে দুধ বা ফর্মুলা বার বার বানাতে হয়।
- বুকের দুধের অনন্য সংমিশ্রণ মানুষের মস্তিষ্কের বৃদ্ধিতে আদর্শ পুষ্টি প্রদান করে, যা শিশু সহজে হজম ও শোষণ করতে পারে। ফর্মুলা বা গরুর দুধে এই পুষ্টি উপাদান থাকে না এবং পরিমাণের তারতম্যের কারণে সহজে হজমও হয় না।
- ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শিশুর পরিপাকতন্ত্রে দুধ-পরিপাককারী এনজাইম ছাড়া অন্য কোনো এনজাইম তৈরি হয় না। তাই এই সময় বুকের দুধ ছাড়া অন্য কিছু খাওয়ালে শিশু তা হজম করতে না পেরে বদহজম, ডায়রিয়া হয়ে শিশুর ক্ষতি হতে পারে।
- বুকের দুধে রোগ-সংক্রমণের ভয় থাকে না, অন্যদিকে বোতলের দুধ খাওয়ালে সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি থাকে।
- জীবনের প্রথম ৬ মাস পর্যন্ত শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি, বিকাশ এবং সর্বোত্তম স্বাস্থ্য গঠনের জন্য তাকে শুধুই বুকের দুধ পান করানোই যথেষ্ট।

সাব-টপিক ১ : এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং বা শুধুই বুকের দুধ পান করানো

শিশুর ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শুধুই
বুকের দুধ পান করাতে হবে

শিশুর ৬ মাস বয়স পর্যন্ত বুকের দুধ ছাড়া
অন্য খাবার খাওয়ানো নিষেধ

সাব-টপিক ২ : মায়ের বুকের দুধ পান করানোর উপযোগী আচরণসমূহ

মায়ের বুকের দুধ পান করানোর উপযোগী আচরণসমূহ

মায়ের দুধ খাওয়ানোর সময় সঠিক অবস্থান (Position)-এর চিহ্নসমূহ

১. শিশুর মাথা থাকবে মায়ের কনুইয়ের ভাঁজে ও কোমরের নিচের অংশ থাকবে মায়ের হাতের তালুতে

২. শিশুর মাথা, পিঠ ও কোমরের নিচের অংশ একই সমান্তরাল রেখায় থাকতে হবে এবং শিশুর সমস্ত শরীর আগলে রাখতে হবে

৩. শিশুর পেট মায়ের শরীরের সাথে লেগে থাকতে হবে

৪. শিশুর মুখ মায়ের স্তনের কাছে থাকতে হবে

মায়ের দুধ খাওয়ানোর সময় সঠিক সংযোগ (Attachment)-এর চিহ্নসমূহ

১. শিশুর মুখ বড় করে হাঁ করে থাকবে

২. স্তনের কালো অংশ শিশুর মুখের ভিতর থাকবে, তবে ঠোঁটের উপরের দিকে কিছু কালো অংশ দেখা যেতে পারে

৩. নিচের ঠোঁট বাইরের দিকে উল্টানো থাকবে

৪. শিশুর থুতনি মায়ের স্তনে লেগে থাকবে

সাব-টপিক ২ : মায়ের বুকের দুধ পান করানোর উপযোগী আচরণসমূহ

শিশুর সঠিক অবস্থান

সংযোগ

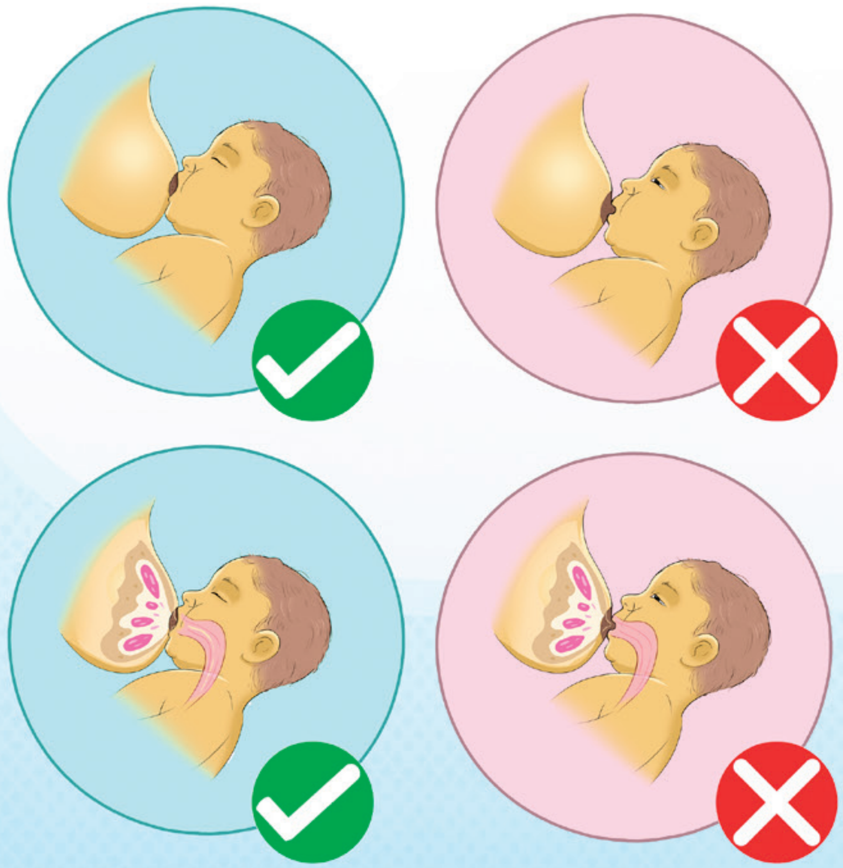

সাব-টপিক ১ : শিশুর বাড়তি খাবার কী, প্রয়োজনীয়তা ও এই খাবার দেওয়ার সময় লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

বাড়তি খাবার কাকে বলে?

শিশুর অতিরিক্ত পুষ্টিচাহিদা মেটানোর জন্য তাকে মায়ের দুধের পাশাপাশি যে পারিবারিক খাবার দেওয়া হয়, তাকে বাড়তি খাবার বলে। শিশুর ৬ মাস বয়সের পর থেকে তার সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য কেবল বুকের দুধই যথেষ্ট নয়, তখন তাকে অন্যান্য খাবারও দেওয়া প্রয়োজন। তাই ৬ মাস পূর্ণ হওয়ার পর থেকে মায়ের দুধের পাশাপাশি প্রতিদিন শিশুর বয়স অনুযায়ী সঠিক পরিমাণে বাড়তি খাবার খাওয়ানো শুরু করা হয়।

মায়ের দুধের পাশাপাশি বাড়তি খাবার কেন প্রয়োজন?

কারণ, মায়ের দুধ-

- ০ থেকে ৬ মাস পর্যন্ত (১৮০ দিন) শিশুর 'প্রয়োজনীয় সকল পুষ্টি' সরবরাহ করে
- ৬ থেকে ১১ মাস পূর্ণ বয়সে – শিশুর 'প্রয়োজনীয় সকল পুষ্টির অর্ধেকেরও বেশি' সরবরাহ করে
- ১২ থেকে ২৩ মাস পূর্ণ বয়সে – শিশুর 'প্রয়োজনীয় পুষ্টির অর্ধেকেরও কম' সরবরাহ করে

এই সময়ে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ভালো হয়। তাই, শিশুর শারীরিক বৃদ্ধির সাথে সাথে অতিরিক্ত শক্তি বা পুষ্টির প্রয়োজন হয়, যা শুধুমাত্র মায়ের দুধে ৬ মাস পর্যন্ত পাওয়া যায়। কিন্তু ৬ মাসের পর থেকে মায়ের দুধই শিশুর জন্য যথেষ্ট নয়, সেজন্য তাকে ৬ মাস পর থেকে বাড়তি খাবার খাওয়াতে হবে। তাই, ৬ থেকে ২৩ মাস পূর্ণ বয়সে প্রয়োজনীয় সকল পুষ্টি চাহিদার ঘাটতিটুকু অবশ্যই ঘরের তৈরি বাড়তি খাবার দিয়ে পূরণ করতে হবে।

বাড়তি/পরিপূরক খাবার দেয়ার সময় লক্ষণীয় বিষয়সমূহ :

- শিশুর বয়স
- খাবারের বৈচিত্র্য ও ধরন
- কতবার খাওয়াতে হবে
- কী পরিমাণ খাবার খাওয়াতে হবে
- খাবারের ঘনত্ব কতটা হবে
- শিশুর ইশারা বুঝে/প্রয়োজন অনুযায়ী খাওয়ানো
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

সাব-টপিক ১ : শিশুর বাড়তি খাবার কী, প্রয়োজনীয়তা ও এই খাবার দেওয়ার সময় লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

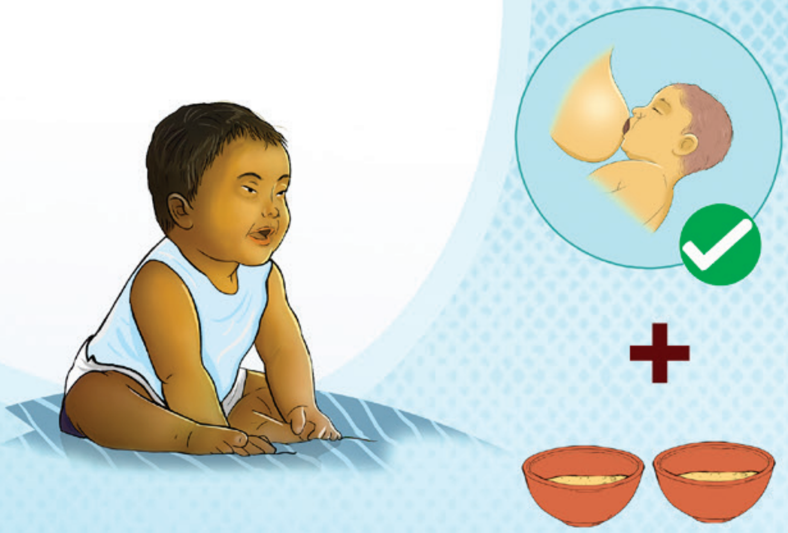

৬-৮ মাস পূর্ণ বয়সি শিশু

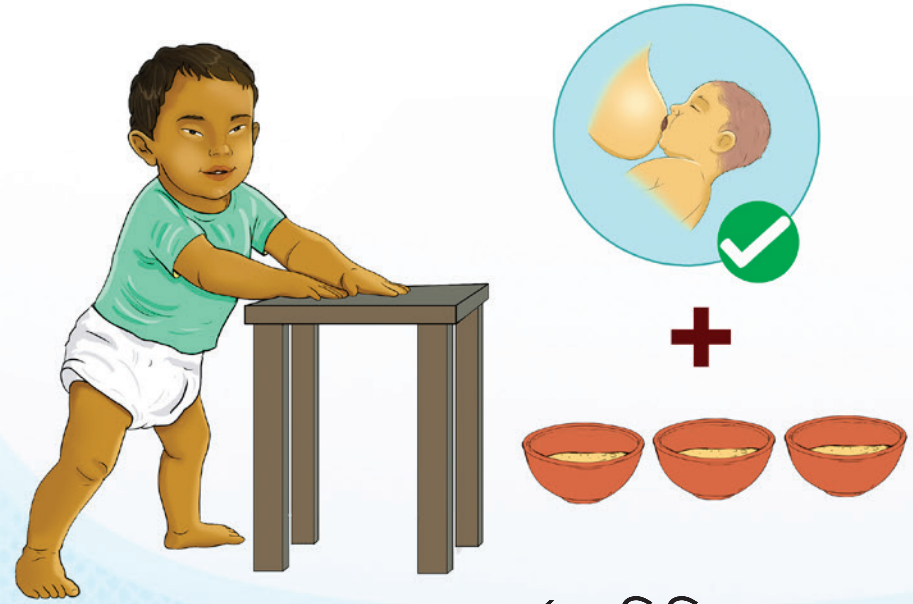

৯-১১ মাস পূর্ণ বয়সি শিশু

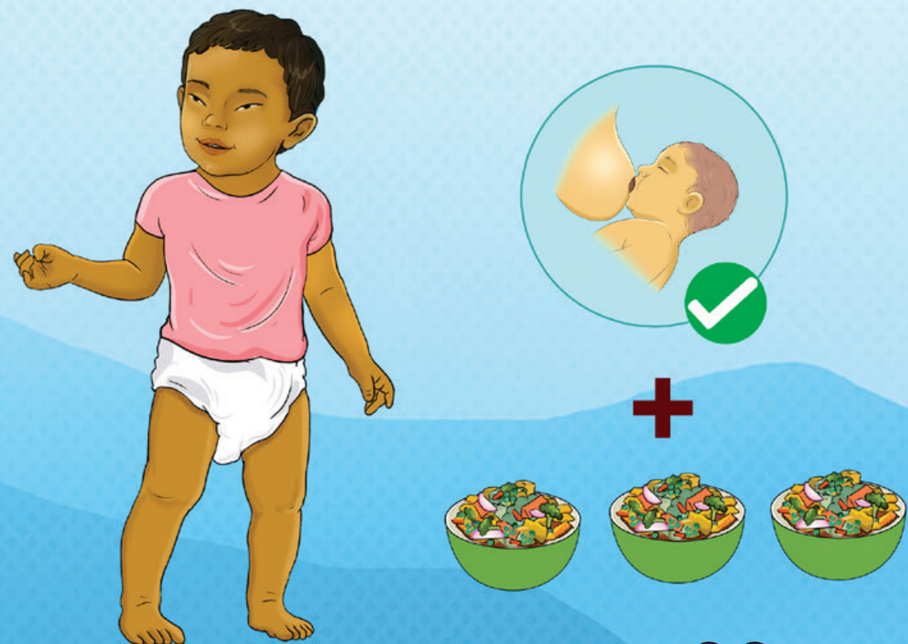

১২-২৩ মাস পূর্ণ বয়সি শিশু

সাব-টপিক ২ : সঠিক বয়স অনুযায়ী বাড়তি খাবারের তালিকা

সঠিক বয়স অনুযায়ী বাড়তি খাবারের তালিকা

শিশুর বয়স	খাবারের বৈচিত্র্য ও ধরন	দিনে কতবার	প্রতিবেলায় খাবারের পরিমাণ (মায়ের দুধের পাশাপাশি)	খাবারের ঘনত্ব
পূর্ণ ৬ থেকে ৮ মাস পূর্ণ বয়সি শিশু	১. শস্যজাতীয় খাদ্য, যেমন : ভাত, রুটি, চিড়া, আলু, সুজি, সাগু ২. বিভিন্ন ধরনের ডালজাতীয় খাবার ও বাদাম ৩. দুধ ও দুধ দিয়ে তৈরি খাবার ৪. প্রাণিজ খাবার : মাছ-মাংস, মুরগির কলিজা ৫. হাঁস, মুরগি, কোয়েল ও অন্যান্য পাখির ডিম ৬. ঘন সবুজ ও লাল শাক, এছাড়াও হলুদ ও কমলা রং-এর সবজি ও ফল, যেমন- মিষ্টি কুমড়া, গাজর, পাকা পেঁপে, পাকা আম, লেবুজাতীয় ফল	২ বার + ঘন ঘন মায়ের দুধ (শিশু যতবার চাইবে) ১-২ বার ঘরে তৈরি পুষ্টিকর নাস্তা/ফল	২-৩ টেবিল চামচ দিয়ে শুরু করতে হবে। ধীরে ধীরে ২৫০ মি.লি./১ পোয়া বাটির আধা বাটি পর্যন্ত বাড়ান	ঘন, নরম চটকানো ঘরে তৈরি খাবার
পূর্ণ ৯ থেকে ১১ মাস পূর্ণ বয়সি শিশু		৩ বার + ঘন ঘন মায়ের দুধ + ১-২ বার ঘরে তৈরি পুষ্টিকর নাস্তা/ফল	২৫০ মি.লি. (১ পোয়া) বাটির আধা বাটি (১/২ বাটি) ঘরে রান্না করা খাবার	ছোট ছোট টুকরো করে কাটা আঙুল দিয়ে ধরা যায় এমন রান্না করা খাবার
পূর্ণ ১২ থেকে ২৩ মাস পূর্ণ বয়সি শিশু		৩ বার + মায়ের দুধ + ১-২ বার ঘরে তৈরি পুষ্টিকর নাস্তা/ফল	২৫০ মি.লি. (১ পোয়া) বাটির এক বাটি	ছোট টুকরো করে কাটা পারিবারিক খাবার

অবশ্যই করণীয়

- শিশুর বয়স ৬ মাস পূর্ণ হলে মায়ের দুধের পাশাপাশি বৈচিত্র্যপূর্ণ পারিবারিক বাড়তি খাবার শুরু করতে হবে।
- ৬-৮ মাস পূর্ণ বয়সি একটি শিশুকে মায়ের দুধের পাশাপাশি ২৫০ মি.লি. বাটির আধা (১/২) বাটি করে দিনে ২ বার ঘন, নরম, চটকানো ঘরে তৈরি পুষ্টিকর খাবার এবং সাথে ১-২ বার পুষ্টিকর নাস্তা দিতে হবে।
- ৯-১১ মাস পূর্ণ বয়সি একটি শিশুকে মায়ের দুধের পাশাপাশি ২৫০ মি.লি. বাটির আধা (১/২) বাটি করে দিনে ৩ বার ছোট টুকরো করে কাটা ঘরে তৈরি পুষ্টিকর খাবার এবং সাথে ১-২ বার পুষ্টিকর নাস্তা দিতে হবে।
- ১২-২৩ মাস পূর্ণ বয়সি একটি শিশুকে মায়ের দুধের পাশাপাশি ২৫০ মি.লি. বাটির এক (১) বাটি করে দিনে ৩ বার পারিবারিক ঘরে তৈরি পুষ্টিকর খাবার এবং সাথে ১-২ বার পুষ্টিকর নাস্তা দিতে হবে।
- শিশুর চাহিদা অনুযায়ী ও ইশারা বুঝে খাওয়াতে হবে।
- খাবার তৈরির ও খাওয়ানোর আগে সাবান পানি দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হবে।
- শিশু অসুস্থ হলেও বুকের দুধের পাশাপাশি বাড়তি খাবার চালিয়ে যেতে হবে।

সাব-টপিক ২ : সঠিক বয়স অনুযায়ী বাড়তি খাবারের তালিকা

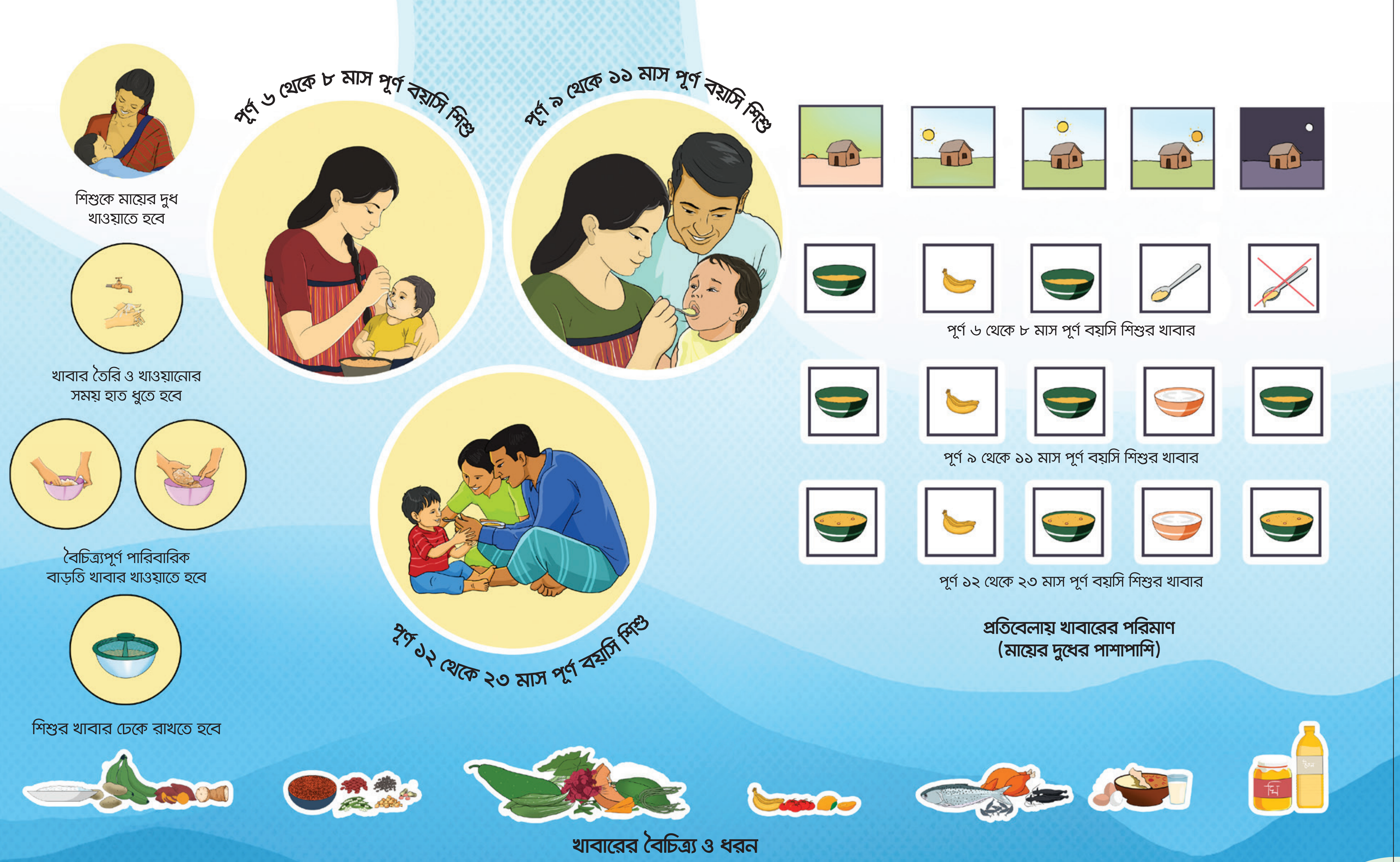

সাব-টপিক ১ : পুষ্টিগুণ বজায় রেখে খাবার রান্নার পদ্ধতি এবং সুষম খাদ্য নির্বাচন ও ক্রয়

পুষ্টিগুণ বজায় রেখে খাবার রান্নার পদ্ধতি

খাবার প্রস্তুত ও রান্নার সময় কিছু দিকে দৃষ্টি দেয়া জরুরি। যেমন : শাকসবজির পুষ্টিগুণ নির্ভর করে কতক্ষণ ধরে রান্না হচ্ছে তার ওপর। চুলার আঁচ বাড়িয়ে বেশি সময় ধরে শাকসবজি রান্নায় তরকারিতে মিশে থাকা ভিটামিন 'বি' ও 'সি' এর পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ, কাঁচা অবস্থায় এই সব খাবারে যে পরিমাণ পুষ্টিগুণ থাকে তার চেয়ে কমে যায়।

সুষম খাদ্য নির্বাচন ও ক্রয়

- খাদ্য তালিকায় পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য উপাদানসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা
- স্থানীয় বাজার থেকে সতেজ শাকসবজি ক্রয় করা
- প্রতিদিনের জন্য যতটুকু শাকসবজি ক্রয় করা প্রয়োজন তাই ক্রয় করা
- খাদ্য উপকরণ ক্রয়ের সময় বৈচিত্র্যতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া

এজন্য খাবার তৈরিতে স্বাদের পাশাপাশি পুষ্টির বিষয়টি মাথায় রাখা জরুরি, সেই সাথে সহজে হজমযোগ্য হবে কি না, জীবাণুমুক্ত হলো কি না - এই বিষয়গুলোও খেয়াল রাখা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে নিচের সতর্কতাগুলো আমরা অনুসরণ করতে পারি :

১. রান্না করা খাবার থেকে কাঁচা মাছ-মাংস, শাকসবজি ইত্যাদি আলাদা রাখতে হবে।
২. মাছ-মাংস, শাকসবজি কাটার আগে দা/বটি/ছুরি, হাঁড়ি-পাতিল ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে।
৩. শাক-সবজি নিরাপদ পানি দিয়ে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে বড় বড় টুকরো করে কাটতে হবে।
৪. রান্নার সময় ঢাকনা ব্যবহার করতে হবে।
৫. মাছ-মাংস, ডিম ভালো করে সিদ্ধ করে রান্না করতে হবে।
৬. রান্নার সময় চুলার তাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।
৭. শাকসবজি রান্নার সময় উচ্চ তাপে ও কম সময়ে রান্নার পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে অর্থাৎ, অনেকক্ষণ ধরে সিদ্ধ করা যাবে না।
৮. কাটার পর ফল ও শাক-সবজি বাতাসে খোলা অবস্থায় রাখা যাবে না, এতে পুষ্টিগুণের অপচয় হয়।
৯. ভাজায় ব্যবহৃত তেলের পুনঃব্যবহার এড়িয়ে চলুন।
১০. শাকসবজি রান্নার সময় পরিমাণমতো তেল ও আয়োডিনযুক্ত লবণ দিয়ে রান্না করতে হবে।
১১. ডাল ও বীজ-জাতীয় খাবার বেশি সময় নিয়ে ভালোভাবে সিদ্ধ করতে হবে।

এছাড়াও, খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশনকারীর ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন : দুই হাতের নখ কেটে ছোট রাখা, হাতে কোনো ক্ষত বা কেটে গেলে গ্লাভস ব্যবহার করা, মাথার চুল ঢেকে রাখা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় ও অ্যাপ্রন পরিধান করা, খাবার প্রস্তুতের সময় হাঁচি/কাশি আসলে রুমাল বা ন্যাপকিন অথবা টিস্যু ব্যবহার করা এবং খাবার প্রস্তুত ও পরিবেশনের আগে সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার করা।

সাব-টপিক ১ : পুষ্টিগুণ বজায় রেখে খাবার রান্নার পদ্ধতি এবং সুষম খাদ্য নির্বাচন ও ক্রয়

রান্না করা খাবার থেকে কাঁচা মাছ-মাংস, শাকসবজি ইত্যাদি আলাদা রাখতে হবে

শাক-সবজি নিরাপদ পানি দিয়ে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে
বড় বড় টুকরো করে কাটতে হবে

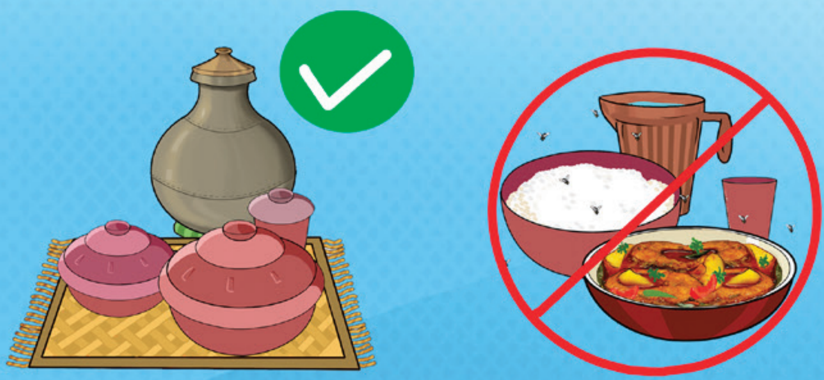

খাওয়ার সময়ে খাবার খোলা রাখা যাবে না,
ঢাকনা ব্যবহার করতে হবে

রান্নার সময় খাবার খোলা রাখা যাবে না,
ঢাকনা ব্যবহার করতে হবে

সাব-টপিক ২ : রান্নায় তেল ও লবণের ব্যবহার

রান্নায় তেলের ব্যবহার

- প্রয়োজনীয় পরিমাণ রান্নার তেল ব্যবহার করুন। অতিরিক্ত ভাজা ও তৈলাক্ত খাবার বর্জন করুন।
- শাকসবজি রান্নায় তেলের ব্যবহার চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন 'এ', 'ডি', 'ই', 'কে' ইত্যাদি পরিশোষণ করতে সাহায্য করে।
- তেল ও চর্বি খাবারের সুগন্ধ ও স্বাদ বাড়ায়।
- যেকোনো সবজি রান্না বা সিদ্ধ করলে অবশ্যই এক ফোঁটা তেল ব্যবহার করতে হবে।

রান্নায় লবণের ব্যবহার

- লবণ খাবারের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান এবং এটি স্বাদ বৃদ্ধি করে।
- উচ্চমাত্রায় লবণ এবং মশলা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকুন এবং খাবারের সময় বাড়তি লবণ গ্রহণ থেকে বিরত থাকুন।
- অতিমাত্রায় লবণ গ্রহণ করলে হাইপারটেনশন বা উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।
- যেকোনো তরকারি রান্না হয়ে গেলে চুলা থেকে নামানোর ২/৩ মিনিট আগে লবণ দিয়ে তরকারির পাত্র নামিয়ে নিতে হবে। এতে করে তরকারিতে আয়োডিনের মাত্রা ঠিক থাকে।

সাব-টপিক ২ : রান্নায় তেল ও লবণের ব্যবহার

সাব-টপিক ৩ : স্বাস্থ্যসম্মতভাবে হাত ধোয়ার নিয়মাবলি

হাতের মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে, তাই হাত ধোয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কখন হাত ধোয়া উচিত

- খাবার তৈরির সময়
- খাবার গ্রহণের আগে
- শিশুদের খাওয়ানোর আগে
- টয়লেট ব্যবহারের পরে
- পোলট্রি অথবা কাঁচা মাংস ও ডিম ধরার পরে
- বাচ্চাদের ডায়াপার বা ন্যাপকিন বদলানোর পরে
- নাক পরিষ্কারের পরে
- আবর্জনা ধরলে
- রাসায়নিক দ্রব্যাদি ধরলে
- খেলাধুলার পরে
- পোষা প্রাণীদের সাথে খেলার পরে
- হাত ও পায়ের নখ কাটার পর

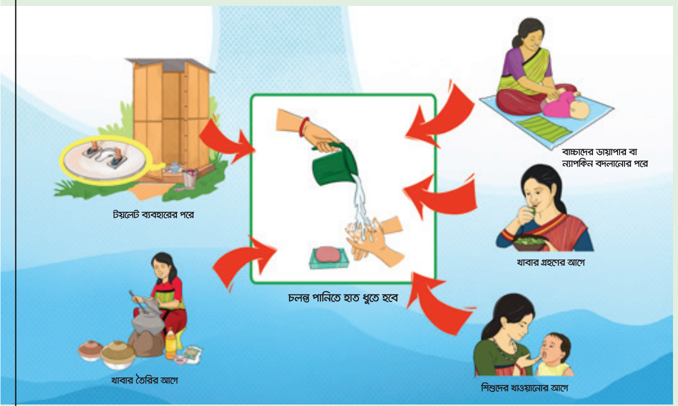

মনে রাখা জরুরি

চলন্ত পানিতে হাত ধুতে হবে। গামলায় বা বাটিতে হাত ধুলে ময়লা ও রোগজীবাণু পরিষ্কার হয় না।

সাব-টপিক ৩ : স্বাস্থ্যসম্মতভাবে হাত ধোয়ার নিয়মাবলি

সাব-টপিক ১ : বাল্যবিয়ে এবং এর কুফল

'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭' অনুযায়ী –

নির্ধারিত বয়সসীমার (মেয়েদের ১৮ বছর এবং ছেলেদের ২১ বছর) নিচের বয়সে কোনো বিয়ে হলে তাকে বাল্যবিয়ে বলে।

শারীরিক ক্ষতি	অপ্রাপ্ত বয়সে গর্ভধারণের ফলে সৃষ্ট সমস্যাসমূহ	মানসিক ক্ষতি	সামাজিক ক্ষতি
• ২০ বছর বয়সের পূর্বে মেয়েদের শরীর সন্তান গ্রহণের জন্য পরিপক্ব হয় না। মেয়েদের দৈহিক পূর্ণতা প্রাপ্তির আগেই যদি কেউ সন্তান ধারণ করে তাহলে তার দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়, সে ক্ষেত্রে মা ও শিশুর মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ে। • অল্প বয়সে মা হলে মেয়েদের পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়। • অল্প বয়সে বিয়ে হলে কিশোরীদের বিভিন্ন প্রকার শারীরিক জটিলতা দেখা দেয়। সন্তান প্রসবকালে অনেক কিশোরী মারাও যেতে পারে। • কম ওজন, অপুষ্ট ও রুগ্ন শিশুর জন্ম হয়। • ঠিকমতো শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারে না বলে শিশু মায়ের দুধ থেকে বঞ্চিত হয়। • বাল্যবিয়ের ফলে কিশোরী মায়েরা সঠিকভাবে সন্তান লালন-পালন করতে পারে না। • প্রসবজনিত জটিলতার কারণে কিশোরী মায়ের প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের ফলে দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সৃষ্টি হয়। • ঘন ঘন সন্তান প্রসবের কারণে সন্তান লালন-পালনে সক্ষমতা কমে যায়।	• প্রসবের জটিলতা • কম ওজন বিশিষ্ট শিশুর জন্ম হওয়া • রক্তস্বল্পতা • প্রসব-পরবর্তী অবসাদ • মা ও নবজাতকের মৃত্যু • অকাল গর্ভপাত • অপুষ্টিজনিত কারণে শিশুমৃত্যু • সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়া	• মানসিক পরিপক্বতা ও বোঝার ক্ষমতা ব্যাহত হয়। • কৈশোরকালীন সময়ে তার নিজের মানসিক পরিবর্তনই পূর্ণ হয় না, তার ওপর মা-বাবা হলে অতিরিক্ত চাপ নিতে পারে না, ফলে তাদের মানসিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। • অল্প বয়সে মা হলে সংসারের দায়দায়িত্ব নিতে হয়। এর ফলে লেখাপড়া করতে পারে না। তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ থাকে না। • দাম্পত্য কলহ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। • পারিবারিক সহিংসতা বেড়ে যায়। • অল্প বয়সি পুরুষের পক্ষে সংসারের দায়দায়িত্ব নেয়া কষ্টকর হয়। • কিশোর-কিশোরীরা তাদের আনন্দ ও বিনোদন থেকে বঞ্চিত হয়। • অল্প বয়সি বিবাহিত কিশোরী স্বামী সংসারের অনেক চাহিদা মেটাতে পারে না, তাই নানারকম জটিল সমস্যায় পড়ে।	• বাল্যবিয়ের ফলে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, ফলে তারা ভবিষ্যতে আয় রোজগার করতে পারে না। • কিশোরদের ক্ষেত্রে স্ত্রী এবং সংসারের প্রতি অবহেলা দেখা দেয়। • বাল্যবিয়ের ফলে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে শিক্ষিতের হার কমে যায়। • কম শিক্ষার কারণে কর্মদক্ষতা অর্জন করতে না পারায় ভালো কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। • বাল্যবিয়ের ফলে কিশোরীরা প্রতি পদে যেমন : শিক্ষা, খাদ্য বণ্টন, চিকিৎসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা ও নারী নির্যাতনের শিকার হয়। • পারিবারিক যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে কোনো মেয়ে তালাকপ্রাপ্ত হলে তার পরিবারের কাছে সে সারা জীবনের জন্য বোঝা হয়ে থাকে। • অনেক সময় দুই পরিবারের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। • পারিবারিক সম্পদ বন্টনে অসমতা দেখা দেয়। • নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষমতা ও সুযোগ কমে যায়।

সাব-টপিক ১ : বাল্যবিয়ে এবং এর কুফল

সাব-টপিক ২ : জেন্ডার ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা বলতে বোঝায় নারী ও মেয়েশিশুর প্রতি সংঘটিত সেই সহিংসতা, যা শুধু নারী বলেই তার প্রতি হয়ে থাকে। এই সহিংসতার মাধ্যমে এমন ভীতি তৈরি করা হয় যার ফলে নারী জোরপূর্বক বা ইচ্ছাকৃতভাবে স্বাধীনতা ও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। পুরুষ, তরুণ বা কিশোররাও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার শিকার হতে পারে। তবে, আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীরাই এই সহিংসতার শিকার বেশি হয়। জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য থেকে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ঘটনা ঘটে থাকে।

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ধরন

শারীরিক নির্যাতন	মানসিক নির্যাতন	যৌন নির্যাতন	আর্থিক ক্ষতি
এমন কোনো কাজ বা আচরণ করা, যার কারণে নারী ও শিশুর জীবন, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা বা শরীরের কোনো অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয় অথবা, ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কা থাকে। যেমন : • যেকোনো শারীরিক নির্যাতন (ধাক্কা দেওয়া, গলা টিপে ধরা, চড়-থাপ্পড় মারা, চুলের মুঠি ধরে টানা ইত্যাদি) • অ্যাসিড আক্রমণ • পাচার (নারী ও শিশু) • অপহরণ • হত্যা	মানসিক সহিংসতার মধ্যে রয়েছে হয়রানি অথবা ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ অর্থাৎ, স্বাভাবিক চলাফেরা, যোগাযোগ বা ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও মতামত প্রকাশের ওপর হস্তক্ষেপ, যেমন : • কোথাও যেতে বাধা দেওয়া • বকাঝকা করা, হেয় করে কথা বলা • সন্দেহ করা • বিরক্ত ও অপমান করা • অবহেলা করা • ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দ বা মতামতের গুরুত্ব না দেয়া • বিভিন্ন ধরনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা • সাইবার বুলিয়িং	**ক. যৌন নিপীড়ন/নির্যাতন-** • ধর্ষণের চেষ্টা, ধর্ষণ, দলবদ্ধ ধর্ষণ • প্রতারণামূলক বিয়ে বা অনুমতি ছাড়া যৌন সম্পর্ক স্থাপন • জোরপূর্বক যৌন ব্যবসায় বাধ্য করা ইত্যাদি **খ. যৌন হয়রানি** • ব্ল্যাকমেইল করা • সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অশ্লীলতার প্রস্তাব	• আর্থিক সুযোগ-সুবিধা, সম্পদ বা সম্পত্তি লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা অথবা সেগুলোর ওপর বৈধ অধিকার প্রয়োগে বাধা প্রদান • নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র প্রদান না করা • বিয়ের সময় প্রাপ্ত উপহার বা দান হিসেবে প্রাপ্ত কোনো সম্পদ থেকে নারীদের বঞ্চিত করা

এছাড়াও আরো কিছু হয়রানি ও নিপীড়নের ধরন উল্লেখ করা যায়। যেমন :

- যৌক্তিক কোনো কারণ ছাড়াই স্ত্রীকে তালাক দেওয়া
- বহুবিবাহ
- স্ত্রী-সন্তান ত্যাগ ও ভরণপোষণ না দেওয়া
- বাল্যবিয়ে
- ধর্মকে ব্যবহার করে নারীকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা
- যৌতুক দাবি করা
- নারীর আয়কৃত অর্থ বা উপার্জনের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেয়া

বিশ্বে বাল্যবিয়ের সর্বোচ্চ হারের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। যেখানে উদ্বেগজনকভাবে ৫১ শতাংশ মেয়ে ১৮ বছরে বিয়ে করছে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাল্যবিয়েকে বৈধতা দেওয়া অন্যতম দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। নারী ও কিশোরীরা সামান্য আশ্রয় ও সুরক্ষার জন্য ব্যাপকভাবে সহিংসতার শিকার হয়।

সাব-টপিক ২ : জেন্ডার ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা

ছেলে ও মেয়ের খাবারের বৈষম্য

ছেলে ও মেয়ের পড়াশোনার বৈষম্য

শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন

যৌন সহিংসতা (নির্যাতন)

আর্থিক ক্ষতি

সাব-টপিক ৩ : জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার কুফল

নারীর উপর প্রভাব

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার মধ্যে প্রধানতম ধরন হলো নারীর প্রতি সহিংসতা। এটি নারীর জীবনে গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা, মানসিক বিপর্যয়, মানসিক আঘাত এবং কখনও কখনও আত্মহত্যা বা মৃত্যুর মতো পরিণতিও ডেকে আনতে পারে। জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার ঘটনার জন্য পরিবার ও চারপাশের লোকজন নির্যাতিতাকেই দোষারোপ করে থাকে, এতে নির্যাতিতরা আরো বড় মানসিক আঘাতের মুখোমুখি হয়। চলাফেরার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হলে তাদের আত্মবিশ্বাসও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে করে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়। এই মানসিক আঘাত তাদের বিচার প্রাপ্তির অধিকারকেও খর্ব করতে পারে।

শিশুর ওপর প্রভাব

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা শিশুদের মানসিক বিকাশের ওপর গুরুতর প্রভাব ফেলে অভিভাবকদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। এটি শিশুর আবেগ-অনুভূতির বিকাশের পথ রুদ্ধ করে। শিশুদের মধ্যে আচরণগত পরিবর্তন, ভয়, গা-ছাড়া ভাব, বেয়াড়াপনা, অস্থিরতা তৈরি করে। সহিংসতার ভয়ে শিশু ক্রমশ শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। আচরণে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে পারে। এক পর্যায়ে সে মাদকাসক্ত হতে পারে এবং আত্মহত্যার ঝুঁকিতেও পড়তে পারে। একা থাকলে অথবা অস্থির ও অনিরাপদ পরিবেশে বেড়ে উঠলে শিশুরা জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার শিকার হতে পারে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপরও গভীর প্রভাব ফেলে। ব্যক্তি, পরিবার, জনগোষ্ঠী এবং সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতির ওপর এটির স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়ে। সহিংসতার শিকার ব্যক্তিটি চাকরি হারাতে পারেন। এতে তাকে ও তার পরিবারকে ভয়াবহ রকম মানসিক ও আর্থিক সংকটে পড়তে হতে পারে।

জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার কারণে পরিবারের বাইরে যা ঘটে, তা হলো – শিশু নির্যাতন, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, শিশুকে ছেড়ে যাওয়া ও শিশু তার আশ্রয় থেকে ছিটকে পড়া। এটা শুধু যে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নির্যাতিতের অংশগ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করে তাই নয়, এর কারণে বিচার ব্যবস্থার ব্যয় বৃদ্ধি পায়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নারীর প্রতি সহিংসতাকে একটি প্রধান গণস্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা হিসেবে শনাক্ত করে থাকে, যার পরিণতিতে 'ভয়ংকর রকম শারীরিক, মানসিক, যৌন, প্রজননগত এবং মানসিক সমস্যা' দেখা দিতে পারে। সম্পদ ও সুযোগের ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার ক্ষুণ্ন হয়, সুশাসনের অভাবকে আরো প্রকট করে তোলে এবং এভাবে জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

শুধু নারীর কল্যাণের জন্যে নয়, বরং টেকসই উন্নয়ন অর্জনের তাগিদেও রুখে দাঁড়াতে হবে। তাই, জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার উপস্থিতি স্বীকার করে নিয়ে এর বিরুদ্ধে লড়াই করার ব্যাপারটি সকল ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাচ্ছে।

সাব-টপিক ৩ : জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা দেখলে আমরা কোথায় এবং কার কাছে যাবো

Manusher Jonno Foundation
ALD
ASHIKA Development Associates
BNKS "Organization for women & Children Development"
GRAUS
HILL FLOWER
Progressive
TAHZINGDONG
taungya
TRINAMUL UNNAYAN SANGSTHA
Funded by the European Union